গানের আলোকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভূমিজ জনজাতির লোকসংস্কৃতি চর্চা

এম.ফিল (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষকঃ সন্তু সরদার

রেজিস্ট্রেশন নাম্বারঃ 118837 of 2012-2013

পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যাঃ MPCO194006

ক্রমিক সংখ্যাঃ 001700203006

শিক্ষাবর্ষঃ 2017- 2019

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতাঃ ৭০০০৩২

মে, ২০১৯

প্রস্তাবনা

সুন্দরবনে বসবাসকারী আদিবাসী জনজাতির মধ্যে ভূমিজ অন্যতম একটি জনজাতি। পশ্চিমবঙ্গের অন্যন্য অঞ্চলের মতো, সুন্দরবনের উত্তর চব্বিশ পরগণা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা এই দুই জেলাতেও এই জনজাতির বসবাস লক্ষ্য করা যায়। তবে সুন্দরবনের এই দুই জেলার মধ্যে দপক্ষিণ চব্বিশ পরগণাতে অধিকাংশ ভূমিজ জনজাতির মানুষ বাস করে। বেঁচে থাকার জন্য কৃষিকাজ ছাড়াও নদীতে মাছ, কাঁকড়া ধরা এবং বন-জঙ্গলের উপরই এরা নির্ভরশীল। মানুষের বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের লোকসংস্কৃতির দ্বারস্থ হতে হয়। একটি বিশেশ অঞ্চলের বহুবিচিত্র জাতি-জনজাতির অবস্থান তাদের আচার-আচরণ, জীবনচর্চা, পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছু নিয়েই একটি জনসমাজের জীবন ও সংস্কৃতি তৈরি হয়। আমার গবেষণার বিষয় "গানের আলোকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ভুমিজ জনজাতির লোকসংস্কৃতি চর্চা"। এই গবেষণা পত্রে বিভিন্ন পূজার গানের মধ্য দিয়ে উক্ত জনজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ, রীতিনীতি, লোক বিশ্বাস, অলংকার ,ভাষা সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থান অর্থাৎ তাদের জীবনের প্রতিফলিত সমাজ ভাবনা ও প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতি যত ঘটবে মানুষের চাহিদার কাছে প্রয়োজনহীন বিষয়গুলি ক্রমশ হারিয়ে যাবে। আবার সেই সূত্র ধরেই আবার সৃষ্টি হবে লোকসংস্কৃতির নতুন নতুন বিষয়।

সন্তু সরদার

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা -৭০০০৩২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

উচ্চ শিক্ষায় গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণার ধরন যেমন বিভিন্ন তেমনি গবেষণার পদ্ধতিও বহুপ্রকার। যদিও গবেষণাক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে স্নাতকোত্তর স্তরে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে পাঠদান করা হয়, তা সত্ত্বেও আমরা অনেক সময় দেখি গবেষককে কার্যক্ষেত্রে প্রয়শই বিভিন্ন সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়। তাই সেই সমস্যা গুলি থেকে গবেষণার বিষয়টি সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য একজন তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

" গানের আলোকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভুমিজ জনজাতির লোকসংস্কৃতি চর্চা" শীর্ষক গবেষণাপত্রটি নিম্পাদনের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত, ভাষাগত, তত্ত্বগত প্রভৃতি দিক দিয়ে আমাকেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়েছে। এই সকল বিষয়ে সমস্যায় যিনি আমাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমার আলোচ্য গবেষণাপত্রের তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. কুণাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁর নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ। তাঁর চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম অঙ্কিত হোক। বিভিন্ন জটিল বিষয়কে তিনি অত্যন্ত সরল বাকভঙ্গি দ্বারা যেভাবে বোধগম্য করে তোলেন তা সত্যিই অনুকরণযোগ্য। কৃতজ্ঞতা জানাই ড. দেবশ্রী দাত্তারি মহাশয়াকে।

"গানের আলোকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভূমিজ জনজাতির লোকসংস্কৃতি চর্চা" গবেষণাপত্রটি নিম্পাদনের জন্য বিভিন্ন বই, পত্রপত্রিকা ও ক্ষেত্রসমীক্ষার উপর নির্ভর করতে হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ফুলমালঞ্চ অঞ্চলের ভূমিজ জনজাতির কাছে তথ্য ও গান নেওয়া চলাকালীন প্রাসঙ্গিক ভয়েস রেকর্ডে সাহায্য করেছে ভাই সুদীপ সরদার এবং অপূর্ব মাকাল, তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় তথ্য ও গান দিয়ে সহযোগিতা করেছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ফুলমালঞ্চ অঞ্চলের উক্ত জনজাতির সদস্য মঙ্গল সরদার, গৌর সরদার, নির্মল সরদার, ভারতী সরদার, তপন সরদার, অজয় সরদার। এদের প্রতি রইলো শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

প্রয়োজনীয় বই পত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সাহেব হেমব্রম, বিশ্বজিত মন্ডল এদের প্রতি ঋণ অশেষ। বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন প্রদীপ দলুই, গোলজার হোসেন, বিশ্বজিৎ বর্মন, প্রহ্লাদ কৃত্যনিয়া, সব্যসাচী নস্কর, কৌশিক কোটাল এবং টাইপ ও প্রুফের কাজ করেছেন সুব্রত সরকার, রিতম মন্ডল, ইন্দ্র দা এদের প্রতি রইল প্রাণভরা ভালোবাসা। ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রয়োজনীয় উপাদান সামগ্রী এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে মানসিক উৎসাহ যুগিয়েছেন মা, বাবা, ভাই, এদের কাছে ঋণ স্বীকার করা অসমীচীন। তাই এদের প্রতি রইল আমার অসংখ্য ভালোবাসা ও প্রণাম।

সূচীপত্র

ভূমিকা 1-3

প্রথম অধ্যায় 4-19

সুন্দরবনের ভূমিজ জাতির ইতিহাস ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান

দ্বিতীয় অধ্যায় 20-42

ভূমিজ জনজাতির লোকসংস্কৃতি চর্চায় গান

তৃতীয় অধ্যায় 43-62

ভাষা সংস্কৃতি ও অলংকার

উপসংহার 63-64

পরিশিষ্ট 65-70

গ্রন্থপঞ্জী 71-72

ভূমিকা

সংস্কৃতি বলতে যা বুঝায়, লোকসংস্কৃতি তারই একটি অংশ-সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপ। মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, মন-মানসিকতা এবং জীবন লক্ষ্যের চেতনার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে জীবনবোধ এবং তারই প্রকাশ সংস্কৃতি। কেবলমাত্র সাহিত্য বা শিল্পকলার মধ্যেই সংস্কৃতি সীমাবদ্ধ নয়। সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গেও পরিব্যাপ্ত। মানুষের জীবনের সঙ্গে পরিব্যাপ্ত বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি প্রকাশ পায় লোকসংস্কৃতি রূপে। আর লোকসংস্কৃতিকে প্রকাশ করার মাধ্যম গুলির একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হল গান।

একটি সমাজের পরিচয় ফুটে ওঠে সেই সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে। এই দিক থেকে দেখতে গেলে আমরা দেখব যে, ভূমিজ জনজাতির আচার অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে তাদের যে বিশ্বাস, সুখদুঃখ, ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সামগ্রিক জীবনধারার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের মধ্যে নিহিত আছে লোকসংস্কৃতিগত পরিচয়, যা কোনো সাহিত্যের লোকসংস্কৃতির শাখায় হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের গবেষণার মূল বিষয় হল “গানের আলোকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভূমিজ জনজাতির লোকসংস্কৃতি চর্চা”। ভূমিজ জনজাতির লোকসংস্কৃতি অর্থাৎ তাদের চাওয়া পাওয়া, সুখদুঃখ, দেবদেবী সম্পর্কিত লৌকিক বিশ্বাস প্রভৃতিকে গানের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি ভূমিজ জন জাতির জীবনে গানের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই গানগুলির পরিবেশনায় পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সময়ের পরিপেক্ষিতে বাঙালী হিন্দু সংস্কৃতি এবং ভূমিজ সংস্কৃতি পাশাপাশি বসবাস করছে। যার কারনে এই ভূমিজ সংস্কৃতির মধ্যে বাঙালী সংস্কৃতির একটা প্রভাব পড়েছে, তা সত্ত্বেও ভূমিজ জনসমাজ তাদের লোকসংস্কৃতিকে আজও বয়ে নিয়ে চলেছে।

বর্তমানে ভূমিজ জনজাতির মানুষজনের মধ্যে নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ একটু বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার কারণ হিসাবে যদি দেখি তাহলে দেখা

যাবে শিক্ষিত হওয়া। কেননা শিক্ষিত হওয়ার ফলে সংস্কৃতির গুরুত্ব কতখানি তা তারা বুঝতে পারছে, যার ফলে নিজেদের সংস্কৃতিকে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা তথা সুন্দরবনে ভূমিজ জনজাতির লোকসংস্কৃতির ধারা বইতে শুরু করে স্থায়ী বসবাসের পর থেকে। ১৭৭০ সালে কালেক্টর জেনারেল ক্লাউড রাসেলের সময় সুন্দরবনে জঙ্গল হাসিল করে চাষ আবাদ করার তাগিদে ছোটনাগপুর, ঝাড়খন্ড, মানভূমি প্রভৃতি জায়গায় থকে আনা হয় এবং তারপর এখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করে এবং সেই থেকে সুন্দরবনে তাদের লোকসংস্কৃতির অধ্যায় শুরু হয়।

ভূমিজ জনজাতি হল মুন্ডাদেরই একটি শাখা, এরা 'মুন্ডারি' ভাষাতে কথা বলে। কিন্তু সুন্দরবনে দীর্ঘ দিন বসবাসের কারনে তাদের ভাষা হয়ে উঠেছে ইন্দো-আর্য পরিবারের অন্যতম সদস্য ভাষা 'সাদরি' ভাষা। তবে সুন্দরবনে বসবাসকারী ভূমিজরা 'সাদরি' ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও কথা বলে।

সুন্দরবনে বসবাসকারী বাঙালী সংস্কৃতিকে সামনে রেখে এখানকার ভূমিজ জনজাতির লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণাতে।

প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সুন্দরবনের ভুমিজ জনজাতির ইতিহাস ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান। এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে- ভূমিজ জনজাতি মূলত কারা তার ইতিহাস এবং কখন সুন্দরবনে এদের আগমন ঘটেছিল। প্রথম দিকে সুন্দরবন ছিল ঘন জঙ্গল এবং ভয়ঙ্কর জীবজন্তু পরিপূর্ণ একটি অঞ্চল। সেই জঙ্গল পরিপূর্ণ সুন্দরবনকে কৃষি ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছিল। ভয়ঙ্কর জঙ্গল কেটে কৃষি ভূমিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে এখানকার শ্রমজীবী মানুষেরজনের পরিশ্রম ছিল, তা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সুন্দরবনের অর্থনৈতিক সামাজিক ও ভৌগলিক পরিবেশ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ভূমিজ জনজাতির লোকসংস্কৃতি চর্চায় গান। ভূমিজ জনজীবনের লোকসংস্কৃতি চর্চায় গানের প্রভাব কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে

উঠেছে এই অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ, চাওয়া-পাওয়া প্রভৃতিকে ঘিরে লৌকিক দেবদেবী সম্পর্কিত যে বিশ্বাস গড়ে উঠেছে এবং এই বিশ্বাস গানের মধ্যে উঠে এসেছে, যার কারনে গানের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে তাদের সমাজ ভাবনা।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল 'ভূমিজ জনজাতির ভাষা সংস্কৃতি ও অলংকার'। সুন্দরবন তথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভূমিজ জনজাতির কথিত 'সাদরি'ভাষার উৎপত্তি, ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, ক্রিয়ারূপ এবং বাক্যের গঠনশৈলী সম্পর্কে আলোচনা। 'সাদরি 'ভাষার সঙ্গে 'সাঁওতালি' ও 'মুন্ডারি' ভাষার মধ্যে কোনো সাদৃশ্য অথবা তফাৎ আছে কিনা তার একটা তুলনামূলক আলোচনা। আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে 'সাঁওতালি' ও 'মুন্ডারি' ভাষার মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও 'সাদরি' ভাষার সঙ্গে মিল নেই। আবার অলংকারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভূমিজ জনজাতির গানের মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস, রূপক এবং শ্লেষ অলংকারের প্রাধান্য।

সুতরাং বলা যেতে পারে এই গবেষণার মধ্যমে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভূমিজ জনজাতির সংস্কৃতিকে তুলে ধরাই হল উদ্দেশ্য।

প্রথম আধ্যায়

সুন্দরবনের ভূমিজ জনজাতির ইতিহাস ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান

সুন্দরবন অঞ্চলেরভূমিজ জনজাতির ইতিহাস ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের আলোচনা করতে হবে ভূমিজ মূলত কারা, সুন্দরবনের ভূমিজ জনজাতি কারা, তারা কবে থেকে সুন্দরবনে বসতি স্থাপন করল, সুন্দরবনের ভৌগলিক অবস্থানও পরিবেশ এবং তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থান কিরূপ। কেননা, কোনো একটি অঞ্চলের মধ্যে বসবাসকারী একটি সমাজের উন্নতি নির্ভর করে সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থার উপর।

ভূমিজ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যঃ

তথাকথিত আর্যসভ্যতার সংস্পর্শে এসে যে সকল আদিবাসী জনজাতি নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন তাৎপর্য হারিয়ে হিন্দু মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল তাদের মধ্যে ভূমিজদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ বর্তমানে এই ভূমিজ জনজাতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে বসবাস করছে।[1] পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মতো সুন্দরবনেও ভূমিজ জনজাতির বসবাস লক্ষ্য করা যায়।

'ভূমিজ' জনজাতি হল ভারতের মূলত পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, ছোটোনাগপুর, মানভূম জেলায় বসবাসকারী একটি জনজাতি। এই ভূমিজ জনজাতি মূলত অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত 'মুন্ডারি' ভাষাতে কথা বলে। তবে ছোটোনাগপুর ও মালভূমির নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ভূমিজ জনজাতিগণ 'মুন্ডারি' ভাষার সাথে নিজেদের এখনো পরিচিতি রাখলেও পূর্বাঞ্চলের ভূমিজরা এই ভাষাকে হারিয়ে ফেলে স্থানীয় ভাষাকে গ্রহণ করেছে।[2]

---

[1]পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ-ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে, (প্রথম খন্ড), ১৯৮৭, পৃষ্ঠা নাম্বার- ৯১।

[2]ভূমিজ- http://bn.m.wikipedia.org>wiki.

কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন যে, যে সব মুন্ডা ‘ধারে’ কথা বলে না অর্থাৎ যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে, তারাই ভূমিজ। ভূমিজরা তাই মুন্ডাদের ‘ধারুয়া ভূমিজ’ বা মুন্ডা বলে অভিহিত করে।[3]

ভূমিজ জনজাতির ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যে সমস্ত তথ্য উঠে আসছে তেমনি আর একটি তথ্য হল যে “অযোধ্যা পাহাড়-শ্রেণীর পূর্বাঞ্চলবাসী ভূমিজরা বাঙালীদের কাছাকাছি থাকায় বাংলা ভাষায় যেমন কথা বলে, তেমনি তারা নিজেদের ‘ভূমিজ’ বা ‘সর্দার’ বলে পরিচয় দেয়। প্রদ্যোত ঘোষ তিনি তাঁর “ বাংলার জনজাতি” গ্রন্থে বলেছেন যে অযোধ্যা অঞ্চলে বাঙালী হিন্দুরা প্রথম অধিবাসী ভুঁইয়া / ভুঁইয়ার /ভুঁইহারসমগোত্রীয় বলে মনে করে তাদের ‘ভূমিজ’ বলে আখ্যা দেয়। প্রসঙ্গত তিনি আরো বলেছেন যে কেউ কেউ মনে করেন প্রাচীন রাঢ়ভূমির অন্তর্গত বজ্রভূমি বা বজ্জভূমির যে সব রূঢ় ও দুর্দম বর্বর মানুষের কথা জৈন আচারঙ্গ সূত্রে বর্ণিত আছে তারাই এই ভূমিজ গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ”।[4]

রিজলি সাহেব তাঁর “Tribes and Castes of Bengal”গ্রন্থে আদিবাসী জনজাতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ভূমিজ জনজাতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “হিন্দু সংস্কৃতির প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার ভূমিজ জনজাতিগণ নিজেদেরকে একটি পর্যায়ে উন্নিত করে। যার ফলে একটি অনার্য গোষ্ঠী থেকে একটি সম্পূর্ণ উদ্ভূত নতুন বর্ণ হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার একটি নির্দিষ্ট পদ দাবি করে। তবে ছোটো নাগপুরের সীমান্তবর্তী কয়েকটি মুন্ডা অঞ্চল ছাড়া ভূমিজ জনজাতির মূল ভাষা ‘মুন্ডারি’ হারিয়ে বর্তমানে বাংলা ভাষাতে কথা বলে”।[5]

---

[3]বাংলার জনজাতি- প্রদ্যোত ঘোষ, ২য় খন্ড, ২০০৮, পৃষ্ঠা নাম্বার-১৩৮।

[4]বাংলার জনজাতি- প্রদ্যোত ঘোষ, ২য় খন্ড, ২০০৮, পৃষ্ঠা-১৩৯।

[5]Tribes and Castes of Bengal- H. H. Risley, vol. 1, 1891, pg-xliv.

ভূমিজ আন্দোলনেরইতিহাসঃ

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকালে আমরা যদি আদিবাসী ভূমিজ জনজাতির ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখা যাবে, তৎকালীন সময়ে ভূমিজ জনজাতির জীবন, জীবিকা ও সংস্কৃতি খুব একটা সুখের ছিল না। বিভিন্ন চড়ায়-উতরায়ের মধ্যদিয়ে এগিয়ে গিয়েছে ভূমিজ জনজাতির ইতিহাস। আমরা যদি ভূমিজ ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দূরাবস্থার চিত্র। তবে ইতিহাস কিন্তু ভূমিজদের সম্ভ্রমের চোখেই দেখেছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে যে সমস্ত জমিদারগণ ছিল তাদের পাইক ও বরকন্দাজের কাজ করত। যার ফলে তারা বেতনের পরিবর্তে নিস্করজমির উপস্বত্ব ভোগ করত। এই ভূমিজরা তাদের পাওয়া জমিতে আবাদ পত্তনের ব্যবস্থা করত। চাষ করার জন্য তারা বিভিন্ন পরিমানে জমি পেত এবং এর পরিবর্তে তাদের খাজনা দিতে হত। তবে সেটা খুব কম পরিমান এবং নামমাত্র দিতে হত। এই ভূমিজরা যে জমি চাষ করত, তাকে ‘পাইকানজমি’ বলা হত।

দেখাযায় একসময় ব্রিটিশ সরকার আইন করে ঐসব জমিগুলি বাজেয়াপ্ত করে, যার ফলে তাদের জীবিকার পথ একদিক থেকে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর তারা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে এবং যার ফল হিসাবে দেখা দেয় ‘ভূমিজ বিদ্রোহ’। তবে বলা যেতে পারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে মানভূমের ভূমিজ বিদ্রোহ কিন্তু একদিক থেকে ইংরেজ শাসনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। ১৮৩২-৩৩ সালে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গঙ্গানারায়ণ সিং। ভূমিজ বিদ্রোহের ইতিহাসে এই বিদ্রোহ ‘গঙ্গানারায়ণী বিক্ষোভ’ নামে পরিচিত।[6]

কোনো কোনো গবেষকরা ‘চুয়াড় বিদ্রোহ’কে পুরুলিয়া বা মানভূম জেলার কৃষক বিদ্রোহ বলে মনে করেছেন। ১৭৬৭-১৮৩২ সময়কালে অর্থাৎ দীর্ঘ ৬৬ বছর ধরে ইংরেজরা জঙ্গল মহলের বিস্তৃর্ণ মানভূমে সাধারণ চষীদের উপর অন্যায়

[6]পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ- ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে, প্রথম খন্ড, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ৯১।

অত্যাচার করতে থাকে। মানভূমের চাষীরা ইংরেজ সরকারের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন রঘুনাথ মাহাত, গঙ্গানারায়ণ ও বুলি মাহাত। ইংরেজ সরকার কৃষকদের এই বিদ্রোহকে 'চুয়াড় বিদ্রোহ' বলে অভিহিত করেছেন। অনেকে মনে করেছেন যে, চুয়াড় বিদ্রোহের ব্যাপক ফলসস্বরূপে মানভূম জেলার জন্ম হয়েছে।[7]

আদিবাসী জনজাতির আন্দোলের ইতিহাসে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হল 'টুসু- সত্যাগ্রহ' আন্দোলন। এই আন্দোলনে অন্যান্য আদিবাসী জনজাতিকে যেমন উদবুদ্ধ করেছিল, তেমনি ভূমিজ জনজাতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের এই আন্দোলন ছিল মূলত হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে মানভূমের মানুষদের মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার আন্দোলন। 'টুসু' গানের মধ্যে দিয়ে তারা নিজেদের মাতৃভাষার মহিমা প্রচার করতে থাকে।

এই আন্দোলন পরে (ক) 'হালজোয়াল সত্যাগ্রহ', (খ) 'বঙ্গসত্যাগ্রহ' আন্দোলনে রূপ নেয়। এই আন্দোলন গুলির কারনে মানভূমের মানুষদের জীবনে একটা নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

আমরা উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলতে পারি যে ভারতবর্ষের আন্দোলনের ইতিহাসে এই আন্দোলন গুলি প্রভাব ফেলেছিল। এই আন্দোলন গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হলেও এ-ও ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম উৎস। এভাবেই তো ভারতবাসী স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে ছিল।

[7]পুরুলিয়া জেলার সাময়িক পত্রে পুরুলিয়ার ইতিহাস ও সমাজ কথা- shodhganga.inflibnet.ac.in, date-5/2/19, পৃষ্ঠা-১১৭।

সুন্দরবনের ভূমিজ জনজাতির ইতিহাসঃ

সুপ্রাচীন এবং আদিম সময়ে বা সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক যুগে মৌলিক বা প্রাথমিক জঙ্গলগুলি ছিল ভীতিপূর্ণ। এই নিবিড় ঘন জঙ্গলগুলির প্রতিকূল পরিবেশ মানুষের মধ্যে গভীর ভয়ের সঞ্চার সৃষ্টি করতো। একই ঘটনা সুন্দরবনের ক্ষেত্রেও খাটে। জল, মাটি ও বনকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল সুন্দরবন এবং এই সুন্দরবনের তীরে ছিল শ্রমজীবী মানুষদের বসবাস।

কিন্তু সুন্দরবনের প্রতিকূল পরিবেশের ধারায় এসেছে অনেক পরিবর্তন। ১৭৭০ সালের আগে কালেক্টর জেনারেল ক্লাউড রাসেলের সময় থেকে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সুন্দরবনে আবাদি পত্তন বা কৃষি কাজের কারণে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে তোলা হয়েছিল। এই সময়েও সুন্দরবনে হিন্দু নিম্নবর্গ শ্রমজীবী মানুষজন এবং আদিবাসী জনজাতিগণ বসবাস করত। জঙ্গল হাসিলের প্রথমিক সময়ে নেতৃত্ব দিয়ে ছিল এখানকার স্থানীয় কঠোর পরিশ্রমী শ্রমজীবী ও আদিবাসী জনজাতির মানুষজন এবং সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি স্থান থেকে শ্রমজীবী মানুষজন এসে সুন্দরবনকে চাষ যোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হয়।

এছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলের জঙ্গল হাসিল ও আবাদি পত্তনের জন্য প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, ছোটোনাগপুর, গোয়া, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি স্থানথেকেও আদিবাসী জনজাতির মানুষজনকে আনা হয়। এই আদিবাসী জনজাতিগণের মধ্যে ভূমিজ জনজাতির মানুষজনও ছিল।

জঙ্গল পরিষ্কার করা ও আবাদি পত্তনের কারনেই যে তাদের এখানে আনা হয়, তা একটি গানের মধ্যে পরিস্ফূটিত হচ্ছে এবং একটি সময়েরও চিত্র উঠে আসছে। গানটি হল-

“বন জঙ্গল কাটি কুটি।

চাষ করি গো আদিবাসী।

ফাঁকি জুকি দেলাইও মোর বাঙালী জাতি।

হানি হেকি বোকা আদিবাসী”।

ছোটোনাগপুর, ঝাড়গ্রাম, বিহার প্রভৃতি স্থান থেকে আগত ভূমিজ জনজাতির মানুষজন সেই সময় থেকে সুন্দরবনে বসতি স্থাপন করে। ভূমিজ জনজাতি ছাড়াও মুন্ডা, ওরাওঁ, ভুঁইয়া প্রভৃতি জনজাতির মানুষজন বসবাস করে। দীর্ঘ দিন ধরে সুন্দরবনে বসবাসের কারনে এখানকার জীবন জীবিকার সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছে এবং নিজেদের সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে।

নিজেদের সংস্কৃতির আগ্রহঃ

দীর্ঘদিন ধরে তারা সুন্দরবনে অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে বসবাস করছে, তা সত্ত্বেও নিজেদের সংস্কৃতিকে আজও ধরে রেখেছে। কিন্তু দীর্ঘদিন অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করা সত্ত্বেও বর্তমানে নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি তাদের যে বিশেষ আগ্রহ তা লক্ষ্যণীয়। কিন্তু প্রশ্ন হল তারা সুন্দরবনে বসবাসকারী অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে না গিয়ে কেন নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি তারা এত আগ্রহান্বিত?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখব যে সুন্দরবনের অন্যান্য আদিবাসী জনজাতিগুলির মতো ভূমিজরাও প্রথম দিকে জমিদার ও মহাজনদের নানা কাজে নিযুক্ত থাকত।

জমিদার ও মহাজনদের নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি তাদের মনোযোগ দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত সময় ছিল না। তখনকার জমিদার, ভূস্বামী ও মহাজনদের কাজকর্মে এদের দিন কেটে যেত। এছাড়া তৎকালীন সময়ে এরা ছিল নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত ও দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষ। যার ফলে নিজেদের সংস্কৃতির

প্রতি দৃষ্টি দেওয়া তো দূরের কথা, নিজেদের প্রতি সময় দেওয়ারও মতো তেমন পরিস্থিতি ছিলনা। কিন্তু বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে যে তারা স্বনির্ভর হওয়ার কারনে নিজেদের সংস্কৃতিকে জীবন সংস্কৃতি করে তুলতে পেরেছে।[৪]

নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের আরও একটি কারণ হিসাবে দেখা যেতে পারে, সেটি হল শিক্ষিত হওয়া। তখনকার সময়ে ভূমিজ ও অন্যান্য আদিবাসী জনজাতির মানুষজন ছিল নিরক্ষর, তাই সংস্কৃতির গুরুত্ব তাদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষিত হওয়ার কারনে সংস্কৃতির গুরুত্ব প্রাধান্য পাচ্ছে, ফলে নিজেদের সংস্কৃতি সুরক্ষিত হচ্ছে।

সুন্দরবনের ভূমিজ জনজাতির অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থাঃ

সুন্দরবন অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রধানত গ্রামীন এবং কৃষি ভিত্তিক। কৃষির সঙ্গে এখানকার গ্রামীন মানুষ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। সুন্দরবনাঞ্চলের শ্রমজীবীরা প্রকৃতি নির্ভর কৃষিকাজকে প্রধান উপজীবীকা হিসেবে গ্রহন করে এসেছে। সুন্দরবন অঞ্চলকে কৃষিকাজের উপযুক্ত করে তোলার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন জনজাতির মানুষজন এখানে এসেছে এবং একই ধারায় মিশে গেছে।

গঙ্গা ও পদ্মা এবং তাদের অসংখ্য শাখানদী সমূহের পলি মাটি দিয়ে গঠিত সুন্দরবন অঞ্চলের অধিকাংশ ব-দ্বীপ। গঙ্গা ও পদ্মার এই অসংখ্য শাখানদীর পলিমাটি ধান চাষের বিশেষ উপযোগী বলেই প্রাচীন সময় থেকে সুন্দরবনে গ্রামীন কৃষি সমাজ গড়ে উঠেছে।

এখানকার হিন্দু নিম্নবর্গ শ্রমজীবী মানুষের সাথে মুন্ডা, সাঁওতাল, ওরাওঁ, ভূমিজ প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষজন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক সমাজকে গড়ে তুলেছে।

কৃষিকাজের পাশাপাশি মাছ ধরা, কাঠকাটা, মধু সংগ্রহ করাকেও কেন্দ্র করে এখানকার মানুষজনের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়।

---

[৪]মঙ্গল সরদারের কাছে থেকে সংগৃহীত। স্থান- উত্তর মোকামবেড়িয়া, তারিখ- ৪/২/১৯।

আমাদের উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এটুকু বোঝা গেল সুন্দরবনের সমাজ মূলত গ্রামীন কৃষিভিত্তিক সমাজ। কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয় হল সুন্দরবনের ভূমিজ জনজাতির অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল?সুতরাং আমাদের বর্তমান আলোচনার অভিমুখ সুন্দরবন অঞ্চলের ভূমিজ জনজাতির অর্থনৈতিক অবস্থ।

সুন্দরবন অঞ্চলকে আবাদি পত্তন করে তোলার জন্যই ছোটনাগপুর, পুরুলিয়া, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি জায়গা থেকে অন্যান্য আদিবাসী জাতির সাথে ভূমিজ জনজাতির মনুষজনকেও এখানে নিয়ে আসা হয়। যারা ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে। এই প্রাথমিক সময়ে ভূমিজ জনজাতির অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা যে ভালছিলো না তার ধারণা আমরা পূর্বে পেয়েছি। জঙ্গল হাসিল করে এরা যে সামান্য কিছু জমি পেয়েছিল তা তাদের আর্থিক দুরাবস্থা ও সরলতার সুযোগ নিয়ে স্থানীয় জোতদার, মহাজন ও ভূস্বামীরা দখল করে নেয়। তবে এক্ষেত্রে এদেরও কিছু ত্রুটি ছিল। এরা হাঁড়িয়া বা মদ খেয়ে থাকতো এবং এরা বোকা ধরনের ছিল। এদের বোকামো ও সরলতার সুযোগ নিত এইসব ধূর্ত জোতদার শ্রেণির লোক। এই জোতদার শ্রেণির লোক এদেরকে অল্প কিছু ধান কিংবা কিছু মদের বিনিময়ে জমি লিখিয়ে নিত। আমরা দেখব একটি গানের মধ্যে দিয়ে সেই চিত্র কিভাবে উঠে আসছে।[9]

“হায়রে সাধের হাঁড়িয়া, জমি নিলি কাড়িয়া।

জমিদার বাবু রে, দুটি টাকার মদ খেতে দে।

মন আমার ভাল নয়, দুটি টাকার মদ খেতে দে”।

শ্রমজীবী মানুষ চিরকাল অভাবী। দারিদ্র, রোগ, দুর্ভিক্ষ এদের নিত্যসঙ্গী। এই দুঃখ দারিদ্রকে সঙ্গী করে চলে তাদের নিত্য দিনের কাজকর্ম। কৃষিকাজ ছাড়াও তারা

[9]সুন্দরবনের অর্থনীতি, জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ- রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্র কুমার মিস্ত্রী, ২০০৭,পৃষ্ঠা-১২৫।

সারাদিন মাটিকেটে মজুরি খেটে ইত্যাদি নানা রকম ভাবে পরিশ্রম করে, তবে তাদের দুমুঠো পান্তা ভাত জুটতো। কাজেই আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল। তারা তাদের এই পরিশ্রম, দুঃখ দারিদ্র গানের মাধ্যমেও প্রকাশ করত।

যেমন তাদের মাটি কাটার সময়ের একটি গান এখানে উল্লেখিত হল-

"মাটি কাটা ও বড়ি বিষমের কাম,

যেসন দাম তেসম কাম।

খাদ চাপাও ঘোগ বুজাও,

তবে ঘর যাঁউ তবে পান্তা খাঁউ"।

আমরা উপরিউক্ত আলোচনার মধ্যদিয়ে সুন্দরবনের প্রাথমিক সময়কালে বসবাসকারী ভূমিজ জনজাতির অর্থনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। তবে এক্ষেত্রে আমাদের আর একটি দিক আলোচনা করা দরকার, যেটি হল ভূমিজ জনজাতির অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা বর্তমান সময়েও একই আছে; না পরিবর্তন ঘটেছে!

আমরা যদি বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিজ জনজাতির অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও স্বচ্ছলতা এসেছে। পূর্বে এদের সমাজ ছিল গ্রাম ভিত্তিক কিন্তু এখন তারা গ্রাম ছেড়ে শহরমুখি হয়েছে। যেখানে একশ্রেণী রুজি রোজগারের জন্য শহরে আসছে এবং কিছু শ্রেণীর ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হচ্ছে। ফলে তাদের গ্রামীন সমাজের একই সঙ্গে ভাব ও ভাষার অদ্ভূত পরিবর্তন ঘটছে। সুতরাং আমরা আলোচনার ভিত্তিতে বলতে পারি প্রথমিক সময়ে ভূমিজ জনজাতির যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে বর্তমান সময়ে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এই পরিবর্তন তাদের কাছে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

তবে একথাও বলা দরকার যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং ভাষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটলেও তাদের পূর্বতন সংস্কৃতি আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

মানভূমের এবং সুন্দরবনের ভূমিজের অর্থনীতির একটা সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনাঃ

মানভূম এবং সুন্দরবনের ভূমিজ জনজাতির মানুষজন মূলত কৃষিজীবী। চাষ-আবাদ করে তারা জীবীকা নির্বাহ করে। তবে সুন্দরবনের ভূমিজ জনজাতি মানভূমির ভুমিজ জনজাতির চেয়ে অর্থনৈতি দিক থেকে বেশি স্বচ্ছল। তার কারন হিসবে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাব যে সুন্দরবন হল নদীমাতৃক অঞ্চল। গঙ্গা ও পদ্মার পলি মাটি চাষের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। সুন্দরবন যেহেতু বনাঞ্চল এবং নদীমাতৃক অঞ্চল তাই কৃষি কাজের পাশাপাশি মাছ ধরা, কাঁকড়া ধরা, কাঠকাটা, মধুসংগ্রহ প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে অর্থোপার্জন করে পরিবারের ভরণ-পোষণ চালায়। এছাড়া কাছাকাছি শহরের অবস্থিতির কারনে বেকারের সংখ্যা খুবই কম। তাই বছরের বেশির ভাগ দিন কাজের মধ্যদিয়ে কেটে যায়। যার কারনে সুন্দরবনের আর্থিক স্বচ্ছলতা মানভূমের তুলনায় বেশি।

আবার অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যাবেনা। একদিক থেকে শিক্ষাই হল একটি সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান মেরুদণ্ড। আর সুন্দরবনের ভূমিজ জনজাতির মানুষজন মানভূমের ভূমিজ জনজাতির মানুষজনের থেকে শিক্ষাগত দিক দিয়ে তুলনামূলক ভাবে অনেকটা এগিয়ে।

সুন্দরবনের ভূমিজরা যেহেতু শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে, তাই তাদের মধ্যে আধুনিকতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে হাঁড়িয়া, মদ ও নেশা করার প্রবণতা মানভূমের ভূমিজ জনজাতির তুলনায় অনেক কম। সুতরাং এই সমস্ত কারনে সুন্দরবনের ভূমিজদের সামাজিক সঙ্গতি বিধান ও আর্থিক স্বচ্ছলতা অনেকটা উন্নত। এছাড়া সুন্দরবনের অর্থনৈতিক উন্নতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পর্যটনকেন্দ্র।

আমরা যদি মানভূমের ভূমিজ জনজাতির অর্থনৈতিক দিক আলোচনা করি তাহলে দেখা যাবে এখানকার ভূমিজরা মূলত জঙ্গলের কাঠ কেটে জীবীকা নির্বাহ করে এবং এর পাশাপাশি কৃষি কাজ করে জীবীকা অর্জন করে।

কিন্তু সেখানকার মাটি সুন্দরবনের মাটির মতো চাষ করার উপযোগী নয়। মাভূমের মাটি যেহেতু পাথুরে মাটি এবং খরাপ্রবণ এলাকা তাই চাষ-আবাদ তেমন উন্নত নয়, তাই কৃষিকাজকে এখানকার প্রধান জীবীকা হিসাবে গ্রহণ না করে, জঙ্গলের কাঠ কাটাকে তারা প্রধান জীবীকা হিসবে গ্রহন করেছে। এছাড়া চাষ-আবাদ ও কাঠ কাটা যেহেতু একটা নির্দিষ্ট সময়ের উপর নির্ভর করে সেহেতু বছরের অনেকটা সময় কর্মহীন ভাবে কেটে যায়। আর একটা দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে মানভুম অঞ্চল, শহরের থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত। ফলে তাদের পক্ষে শহরে এসে কাজকর্ম করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তাই তাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এই দিকটিকেও চিহ্নিত করা যেতে পারে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি দেখি তাহলে এখানকার ভূমিজরা সুন্দরবনের ভূমিজদের থেকে অনেকটা পিছিয়ে। এর কারন হিসবে অনেকে মনে করেন অর্থনৈতিক সামাজিক প্রতিকূলতা। আসলে মানভূমের ভূমিজ জনজাতির সমাজের মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া এখনো আসেনি এবং তাদের মধ্যে আজও প্রাচীন পন্থা লক্ষ্যকরা যায়। তাই তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিকতার অভাব বোধ। এছাড়া আর একটি কারন হল মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্ত।

এবার আমাদের স্বভাবতই একটি প্রশ্ন জাগে যা এর আগেও ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে তাঁর ‘পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ’ (প্রথম খন্ড) বইতে এই নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেখান থেকে কিঞ্চিত উদ্ধৃত হল– “স্বাধীন ভারতে আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনায় তারা কতখানি উপকৃত হয়েছে ? এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলে রাখি সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, লোধা, শবর, খেড়িয়াদের মতো পশ্চিমাঞ্চলের ভূমিজদের সংঘবদ্ধ বসতি দেখা যায় না; বিভিন্ন অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে

ছিটিয়ে আছে। সুতরাং তাদের খুঁজে খুঁজে বের করে কোথাও তাদের জন্য কোনো বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং এখনও তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনার জন্য আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির খোঁজ-খবর তাদেরই নেওয়া উচিত ছিল"।[10]

সুন্দরবনের ভৌগলিক অবস্থান ও পরিবেশঃ

(ক) ভৌগলিক পরিচয়ঃ

ঐতহাসিককালের সূচনাপর্বে প্রায় খ্রিস্টীয় ১৫০ অব্দে প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও ভৌগলিক টলেমির আন্তর্গাঙ্গেয় ভারতবর্ষের নকশায় পৃথিবীশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয় বদ্বীপ সুন্দরবনের ভৌগলিক আকৃতির আভাস বিচিত্রভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারপর ভাঙ্গাগড়ার মধ্যদিয়ে আজ অবধি কেটে গেছে অনেককাল।

সুন্দরবনের ভৌগলিক পরিচয় অন্বেষণ করতে গেলে দেখা যাবে সম্প্রতি আয়লার প্রাদুর্ভাবে সৃষ্টি হওয়া বিপর্যয় পূর্বের সুন্দরবনের ভৌগলিক পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন ভৌগলিক বিপর্যের কারনে সুন্দরবনের যাবতীয় ইতিহাস আবার নতুন করে ভৌগলিক ঐতিহাসিক গবেষকদের অন্বেষণ করতে হবে। সুন্দরবনের এই ভাঙ্গা-গড়ার নতুন অধ্যায় হিসাবে আধুনিক ইতিহাসের ব্যাখ্যায় এর গুরুত্ব মর্মস্পর্শী। আয়লা সুন্দরবনের ভৌগলিক ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে জাতীয় বিপর্যয়। তবে এটুকু বলা যায়-

"মধ্যযুগে মুসলমান ঐতিহাসিক, তারানাথ প্রভৃতি বৌদ্ধ লেখক বা ময়নামতীর গান প্রভৃতি রচনায় ভাগীরথীর পূর্বতীরবর্তী থেকে সুবা বাংলার পূর্বদিক(ঢাকার বাংলাবাজার) পর্যন্ত নিম্নাঞ্চলকে ঘিরে বাটি বা ভাটি বা সুন্দরবনের ভৌগলিক আভাস স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। আবুল-ফজলও পরিস্কার করে বাটি বা ভাটি বলতে সুবা বাংলার এই নিম্নাঞ্চলকেই বুঝিয়েছেন। আর মানিক চন্দ্র রাজার গানে –'ভাটি হইতে আইল বাঙাল লম্বা লম্বা দাঁড়ি'।– এই উক্তিটিতে ভাটির ইঙ্গিত

[10]পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ- ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে, প্রথম খণ্ড, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ১০৪।

সমুদ্রশায়ী খাড়িময় নিম্নভূমি বা বাঙাল ভূমির দক্ষিণাংশের ভৌগলিক ভূমির দিকেই স্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে"।[11]

বর্তমান সময়ে সুন্দরবনের যে আধুনিক ভৌগলিক সূচনার সন্ধান পাচ্ছি, তার উপর ভিত্তি করে আমরা বর্তমান সুন্দরবনের ভৌগলিক অবস্থান চিহ্নিত করতে পারি। তবে বর্তমানে সুন্দরবনের চালচিত্রে, ঐতিহাসিক কালের ভৌগলিক দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ঘটেছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত ধরে সুন্দরবন ক্রমপ্রসারিত হয়েছে। ফলে আধুনিক ইতিহাস ও জনজীবনের গতিধারায় সুন্দরবনের ভৌগলিক ঐক্য নতুন নতুন গবেষক ও বিজ্ঞানীদের চোখে পরিবর্তিত হয়েছে।

সুন্দরবন অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের সর্বদক্ষিণে সংরক্ষিত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এবং উত্তর চব্বিশ পরগণার কয়েকটি ব্লক, মোট ১৬ টি থানা, এছাড়া জোয়ার- ভাঁটা দ্বারা প্লাবিত শতাধিক দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই সুন্দরবন অঞ্চল।

গঙ্গা - মেঘনা - ব্রহ্মপুত্র নদীর ব-দ্বীপ ভূমির দক্ষিণ অংশ জুড়ে বঙ্গোপসাগরের কোলে বাংলাদেশ ও ভারতীয় ভূ-খন্ডে অবস্থিত সুন্দরবন। গঙ্গা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় নদীবাহিত পলি সমৃদ্ধ ভারত ও বাংলাদেশের ছটি জেলায় প্রায় ২৫,৫০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে লবনাম্বু উদ্ভিদের বাস্তুভূমি, বসুধার ঐতিহ্য এই সুন্দরবন। পৃথিবীর বৃহত্তম সদাসৃজনশীল গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অংশ এই সুন্দরবন কমবেশি এক-তৃতীয়াংশ ভারতের আর দুই-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশের অর্ন্তভুক্ত। ভারতীয় সুন্দরবনের বিস্তৃতি পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৮০ কি.মি. দীর্ঘ উপকূল এলাকার ১৩০ কি.মি. তটরেখা জুড়ে। বাংলাদেশের মোট ৭১০ কি.মি. উপকূল রেখার প্রায় ২১০ কি.মি. অংশ বাংলাদেশের সুন্দরবনের বিস্তৃতি।

---

[11]সুন্দরবন অঞ্চলের আদিবাসী সংস্কৃতি- প্রথম পর্ব(সুন্দরবন অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান ও চতুঃসীমা নির্ধারন), shodhganga.inflibnet.ac.in >bitsteam, পৃষ্ঠা- ১। তারিখ- ০২/০৫/১৯।

পশ্চিমবঙ্গের দুটি জেলা যথা উত্তর ২৪ পরগণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশ নিয়ে ভারতীয় সুন্দরবন। আর বাংলাদেশের সুন্দরবন সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট ও কক্সবাজার জেলার অর্ন্তগত।[12]

সুন্দরবনের পরিবেশঃ

১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে মূলতঃ ক্লাউড রাসেলের তত্ত্বাবধানে সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে কৃষিজমি সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। বর্তমানে সুন্দরবন অংশে মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২টি, তার মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে জঙ্গল হাসিল করে কৃষিজমি আবাদ হয়েছে, এবং অবশিষ্ট ৪৮টি দ্বীপ সংরক্ষিত বনাঞ্চল যেখানে কোনো জনবসতি নেই।

এই জনবসতি এলাকা এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকার মধ্যে একটা অদৃশ্য নিগুঢ় সম্পর্ক লুকিয়ে আছে। দক্ষিণের সমুদ্রের সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এবং ভয়ঙ্কর ঝড় ঝঞ্ঝার হাত থেকে এই জনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলিকে রক্ষা করে রেখেছে। সুন্দরবনের পরিবেশ বলতে গেলে মূলত প্রাকৃতিক পরিবেশকে বোঝায়। তবে বর্তমানে সুন্দরবনের এই প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তার ভারসাম্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কেননাএখানকার মানুষের জীবন জীবীকা এই পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল।

আমরা এই পরিবেশকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি –(ক) দূষিত পরিবেশ, (খ) বিশুদ্ধ পরিবেশ। 'দূষিত পরিবেশ' বলতে আমরা যা বুঝি তা হল সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের বেঁচে থাকার জন্যে অনুপযোগী প্রতিকূল পরিমন্ডল এবং 'বিশুদ্ধ পরিবেশ' বলতে যা বোঝায় তা হল সমস্ত উদ্ভিদকূল ও প্রাণীকূলের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ। তবে আমাদের আলোচনার বিষয় হল সুন্দরবনের পরিবেশ। এই পরিবেশ মানুষের সৃষ্টি নয়, এটি প্রকৃতির সৃষ্টি। বড় বড় নদী, ঘন জঙ্গল, বাঘ-কুমীর, হাঙর, সাপ, বানর, হরিন, বিভিন্ন ধরনের পাখি প্রভৃতি নিয়ে

[12]সুন্দরবন অঞ্চলের আদিবাসী সংস্কৃতি- প্রথম পর্ব(সুন্দরবন অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান ও চতুঃসীমা নির্ধারন), shodhganga.inflibnet.ac.in >bitstream. পৃষ্ঠা-২।তারিখ-০২/০৫/১৯।

গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের অরণ্যের পরিবেশ। পুরানো দিনে সুন্দরবনে যে সমস্ত উদ্ভিদ ও জীবজন্তু ছিল বর্তমানে তা অনেকটা লুপ্ত হয়ে গেছে। এ জন্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী জঙ্গলের উপর মানুষের হস্তক্ষেপ।

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি ঝড়ের প্রকোপ থেকে বৃহৎ সুন্দরবনের গ্রামীন লোকায়ত জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলকে এই ম্যানগ্রোভ অরণ্যের জঙ্গল রক্ষা করে রেখেছে। অথচ স্বাধীনতার আগে বা পরেও এই সুন্দরবনের বন সংরক্ষণ বা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উপযুক্ত প্রচেষ্টা তেমনভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বরং যে টুকু হচ্ছে, তার সবটুকু মূলত যেন একটা গতানুগতিক ব্যবস্থায় চলছে।

সত্তরের দশক থেকে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ নানারকম ভাবে পরিবর্তীত হয়েছে।

বর্তমানে সুন্দরবনের অরণ্যভূমি কেটে নেওয়ার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার পিছনে রয়েছে প্রকৃতির ওপর মানুষের হস্তক্ষেপ। একদিকে একশ্রেণির মানুষ জীবীকা নির্বাহের জন্য বনের কাঠ কেটে বন ধ্বংস করছে এবং মাংসের জন্য হরিণ শূকর সহ অন্যান্য প্রাণী হত্যা করে চলেছে।এক শ্রেণীর চোরা শিকারী দেশী বা বিদেশী বাজারে উচ্চমূল্যে বাঘের চামড়া বিক্রি করার জন্য চুরি করে নির্বিচারে বাঘ হত্যা করে চলেছে। সুন্দরবনের দামী দামী কাঠ এবং জ্বালানী কাঠ কেটে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস করেছে এক শ্রেণীর মানুষ। এছাড়া জঙ্গল কেটে ভেড়ী তৈরী করে মাছ চাষ করছে, একারনে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ ধ্বংসের মুখে।

সুতরাং আমরা আলোচনার পরিশেষে বলতে পারি, সুন্দরবনের এই ভৌগলিক পরিবেশ যে শুধু মাত্র মানুষের জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ তা নয়। কেননা সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র গতিশীল। ফলে জীব পরিমন্ডল নদী-নালা, খাঁড়ি, নদীবাঁধ, ম্যানগ্রোভ, কৃষি, জলবায়ু, পরিবহণ, মানুষ, পর্যটন এই সব কিছু নিয়ে গড়ে উঠেছে। তবুও ভৌগলিক বাস্তুতন্ত্রের নিরিখে অসংখ্য জীব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ চিরহরিৎ লবণাম্বু উদ্ভিদের বনভূমি সুন্দরবন বিশ্বঐতিহ্যের ক্ষেত্র হিসাবে স্বীকৃত।

পাশাপাশি এ-অঞ্চলের মানুষের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, দেবদেবী, লোকাচারসহ দৈনন্দিন জীবন এ ভূমির সাথে একাত্ম হয়ে রয়েছে। এমন কি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও এ অঞ্চলের মানুষকে এই ভৌগলিক অবস্থান থেকে সরাতে পারেনি।

সুন্দরবনের বর্তমান যে রূপ আমরা দেখতে পাই তার ইতিহাস রচনা শুরু হয় ১৭৭০ সালে চব্বিশ পরগণার কালেক্টর জেনারেল ক্লড রাসেল এবং ১৭৮১সালেযশোরের প্রথম জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট এবং সুন্দরবনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ টিলম্যান হেঙ্কেলের হাত ধরে।[13]

[13]সুন্দরবন আবাদের ইতিহাস ও তার বর্তমান অবস্থা- shodhganga.inflibnet.ac.in. date-4/29/19, পৃষ্ঠানাম্বার- ৮০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমিজ জনজাতির লোকসংস্কৃতি চর্চায় গান

মানব জীবনোচ্ছ্বাসেরসর্বোচ্চ পর্যায়ের কলা-কৃষ্টিগুলিরমধ্যেএকটি হল গান। নদীমাতৃক সুন্দরবনের অপরূপ মনোরম পরিবেশের স্বাভাবিক নিয়মে প্রকাশ পেয়েছে আদিবাসী জনজীবনের আনন্দ-উচ্ছ্বাসময় দিক। তাদেরজীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাবলী ,চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ কে ঘিরে দেব-দেবী সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস তাদের মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে আছে, যা তাদের এই আনন্দময় দিক কে আরও উজ্জ্বলময় করে তোলে। আর এই সমস্ত কিছু তুলে ধরার পিছনে গানের ভূমিকা অনবদ্য।

সুন্দরবনের লোকসমাজ প্রধানত গ্রামীণ এবং কৃষি ভিত্তিক। আমাদের দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় এখানকার মানুষকে প্রতিকূল আবহাওয়া এবং অন্যান্য সমস্যা গুলির কারনে বিপদসঙ্কুল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। সুন্দরবনের ভয়াবহ এই পরিবেশের উপর বিপুলসংখ্যক জনগন নির্ভরশীল এবং এই কারনে তাদের মধ্যে একটা ঐক্য গড়ে উঠেছে; যা মূলত তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকেই প্রকাশ করে। তাই সুন্দরবনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় হয়।

সুন্দরবনের সাধারণ মানুষজন ছিলেন অত্যন্ত ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন, কিন্তু তাদের মধ্যে ধার্মিকতার কঠোর মনভাব ছিল না। শ্রমজীবী মানুষদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যে সংগ্রাম তা ধর্মীয় সংকীর্ন মনস্তত্ত্ব ও মৌলবাদ কে অস্বীকার করে। বরং এর পরিবর্তে তাদের মধ্যে আছে বিভিন্ন ধর্মীয় এবং লৌকিক দেব-দেবী সম্পর্কিত বিশ্বাস। আর এই সমস্ত দেব-দেবী সম্পর্কিত লৌকিক বিশ্বাস নিয়ে গড়ে ওঠে লোকসংস্কৃতি।

এখানকার লোকসংস্কৃতির কেন্দ্র বিন্দুতে দীর্ঘ দিন ধরে বিরাজ করছে আদিবাসী জনজাতি। জঙ্গল হাসিল করার তাগিদে ছোট নাগপুর,ঝাড়খণ্ড, মানভূম,প্রভৃতি জায়গা থেকে মুণ্ডা, কুর্মী, ভূমিজ, ওরাওঁ প্রভৃতি শ্রেণীর আদিবাসী জনজাতি এখানে আসে। ১৭৭০ সালের আগে কালেক্টর জেনারেল ক্লাউড রাসেলের

সময় যখন বনগুলি কৃষি কাজের কারনে পরিস্কার করে তুলে ছিল,তখন হিন্দু নিম্নবর্গ এবং আদিবাসী জনজাতি এই সুন্দরবনের মধ্যে বসবাস করত। এই সময়ে এই সমস্ত জনজাতি সুন্দরবনের আসল বাসিন্দা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এই সমস্ত আদিবাসী যখন সুন্দরবনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে তখন থেকেই তাদের সংস্কৃতির একটা নিজস্ব ধারা বইতে শুরু করে। আর এই আদিবাসী জনজাতি গুলির মধ্যে একটি হল ভূমিজ জনজাতি।[14]

সুন্দরবনের সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক সময়ে ঘন বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এই বন-জঙ্গল কেটে চাষ যোগ্য করে তোলা হয়। বর্তমান সময়ে এই কৃষি কাজ হয়ে উঠেছে এখানকার বসবাসকারী মানুষের প্রধান জীবিকা। সুন্দরবনে বসবাসকারী জনজাতি গুলির মধ্যে একটি হল ভূমিজ জনজাতি, তাদের শিকার করা প্রধান জীবিকা হলেও, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান জীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে কৃষি কাজ। এই কৃষি কাজ কে কেন্দ্র করে ফসল কাটা, ফসল বোনা, তাদের চাওয়া-পাওয়া,আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে সঙ্গী করে এবং ধর্মীয় লোকায়ত দেব-দেবী কে ঘিরে তাদের মধ্যে লৌকিক বিশ্বাস গড়ে ওঠে।

আর এই দেব-দেবী সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস নিয়ে মূলত গঠিত হয় লোকসংস্কৃতি। আর এই লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত গান গুলি হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ। গান গুলি মূলত ব্যবহার করা হয় পূজার মন্ত্র হিসাবে। গান গুলি হল- আষাঢ়ি গান, টুসু গান, ঝুমুর গান, করম গান,সহরাই গান, গ্রামপূজার গান ইত্যাদি। এই গানগুলিকে কেন্দ্র করে ফুটে উঠেছে দক্ষিন চব্বিশ পরগণার ভূমিজ জনজাতির লোকসংস্কৃতি। আমাদের আলোচনার বিষয় হল "ভূমিজ জনজাতির লোকসংস্কৃতি চর্চায় গান"।

লোকসংস্কৃতি চর্চায় টুসু পূজাঃ

টুসু হল কৃষি ভিত্তিক লোকায়ত সামাজিক পূজা। মূলত লোকায়ত আদিবাসী জন-সমাজের ফসল তোলার সামাজিক উৎসব হল টুসু পূজা। সুন্দরবন তথা দক্ষিন চব্বিশ পরগনার অনেক লৌকিক দেব-দেবীদের মধ্যে টুসু হল একজন অন্যতম

[14]The sundarbans: folk and folk religion- Rafiqul Islam Khokan, http:/www.academia.edu . date-23.4.19, pg-1.

দেবী। এই দেবীর উপাসনার বিস্তৃতি আদিবাসী জনজাতির মধ্যেই সবচেয়ে বেশী। প্রকৃতপক্ষে টুসু একজন প্রাচীন দেবী, যাকে সুন্দরবন ছাড়াও অন্যান্য এলাকাতেও পূজা করা হয়ে থাকে । কৃষকের কাছে দেবী 'টুসু' লক্ষ্মী ও উর্বতার দেবী হিসাবে বিবেচিত হয়। গবেষকরা টুসু কে ফসলের দেবী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই টুসু দেবী শস্যের ভূষি ও শস্য কাটার বা সংগ্রহ করার সময় থেকে ফসলের সঙ্গে যুক্ত আছে। পৌষ মাস হল লক্ষ্মীর মাস। কেননা এই সময় ফসল কেটে বাড়িতে আনা হয়। তখন এই টুসুর পূজা লক্ষ্মীর উপাসনার মতো করা হয়। আদিবাসী জনজাতি বিশ্বাস করে টুসু হল লক্ষ্মী এবং পরিপূর্ণতার প্রতীক। আর এই আদিবাসী জনজাতিরা মূলত ভূমিজ আদিবাসী জনজাতি। টুসু পূজার মাধ্যমে দেবীর কাছে প্রার্থনা করা হয় যে, ঘরের অভাব যেন না থাকে; তা চলে গিয়ে যেন শান্তি, সুখ ও প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।[15]

এখানকার সামাজিক সংহতি ও সম্প্রতি বজায় রাখার জন্য আদিবাসী জনসমাজের নারী-পুরুষ যৌথ উদ্যোগে 'টুসু পূজা' উৎসবের সূচনা করে থাকে। সুন্দরবন তথা চব্বিশ পরগনার বেশীর ভাগ মানুষ চাষী। তবে আদিবাসী ছাড়াও নিম্নবর্গের হিন্দু কৃষক পরিবার যেমন কৃষি দেবী 'টুসু'; তেমনি সমাজের অন্যস্তরের মানুষ ফসল উৎপাদনের কামনায় পুরাণের কৃষি দেবী লক্ষ্মীর উপাসনা করে থাকে। পুরাণের এই লক্ষ্মী দেবীই হলেন ভূমিজ জনজাতির নবরুপায়িতা টুসু দেবী।

আমরা যদি সুন্দরবন এবং পুরুলিয়া এই দুই অঞ্চলের বসবাসকারী ভূমিজ জনজাতির টুসু পূজার পদ্ধতির একটা তুলনা মূলক আলচনা করি তাহলে দেখবযে উভয়ের পূজার পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে কি না। সুন্দরবনের ভূমিজরা টুসু কে শস্যের দেবী হিসাবে পূজিত করে। কিন্তু মানভূমি অঞ্চলে টুসু পূজা শস্যের দেবী ছাড়াও পরব হিসাবে পালন করা হয় এবং তা সারা মাস ধরে চলে। অগ্রাহায়ন মাসের সংক্রান্তি থেকে লৌকিক দেবী টুসুর প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে এই পরবের সূচনা হয়। মেয়েরা দল বেঁধে টুসু পাতে। টুসুর কোন মূর্তি নেই। একটা সরায় নতুন ধানের কুড়ো, বাছুরের গোবর, গাঁদা ফুল,আতপ চাল, দূর্বা ঘাস, তুলসীপাতা ইত্যাদি ঘরের এক কোনায় রেখে টুসু পাতে। সারা মাস ধরে প্রতিদিন

[15] The Sundarbans: Folk and Folk Religion –Rafiqul Islam Khokan, http:/ www.academia.edu. Date – 23.4.19, pg-11.

সন্ধ্যায় চাল ভাজা,চিঁড়া ভাজা,কলা ভাজা, চিনি প্রভৃতি নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা দেয়।[16] কিন্তু দক্ষিন চব্বিশ পরগনায় ভূমিজরা টুসু পূজা করে মূলত পৌষ সংক্রান্তির দিনে। উপকরণ হিসাবে নতুন ধানের তূষ বা ধান, মূলাফল, তুরুল, সরিষাফুল, গাঁদাফুল, গোবর, নাড়ু, দূর্বা, বেগুন পাতা, মিষ্টি, পার্বনের পিঠে ইত্যাদি হাঁড়িতে রাখা হয়। প্রতিমার পাশে একটি গর্ত করা হয়, গর্তটিতে ফুল, দূর্বা, ধান দিয়ে তুরুল কে তিন প্রহরে তিন বার বলি দেওয়া হয়।[17]

পূজোর সময় সকলে গলা মিলিয়ে গান গায়, একে "টুসু গান" বা "টুসু গীত" বলা হয়ে থাকে।গানের মধ্যদিয়ে মেয়েরা তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, বিরহ-ব্যথা ইত্যাদিটুসু দেবীর কাছে প্রকাশ করে। এই পূজার কোন মন্ত্র নেই, গানই হল এই পূজার মন্ত্র।

১. "টুসু ঠাকুর মাগো, আলতা পরা গা গো।

সোনার খাটে হেলান দিচ্ছে, রূপার খাটে পা গো"।[18]

এই গানটি হল টুসু পুজার বন্দনা মন্ত্র। এই গানের মধ্য দিয়ে টুসু দেবীকে বন্দনা করা হচ্ছে ধন সম্পদের দেবী হিসাবে এবং তার সাথে টুসু কে দেখা হচ্ছে একজন আরব্য রজনীর রাজকুমারী হিসাবে। কিন্তু বাঙালী হিন্দু সংস্কৃতি তে টুসু হল দেবী লক্ষ্মী। যাকে শুধু মাত্র ধন-সম্পদের দেবী হিসাবে বন্দনা করা হচ্ছে।

২. "তুমি মাগো লক্ষ্মীদেবী কোমল বরণী।

কমল লতিকা কৃপা কর নারায়ণী।

সাজায়ে রেখেছি মাগো ধান্য-গুয়া-পান।

আসিয়া মাগো কর ঘটেতে অধিষ্ঠান"।[19]

---

[16]'মানভূমের পরব পাইল', মহাবীর নন্দী, 'ছত্রাক পত্রিকা', ৬ষ্ঠ বর্ষ (১৯৭৮), ২য় ও ৩য় সংখ্যা, shodhganga. Inflibnet.ac.in>bitstream. পৃষ্ঠা- ২৫২।

[17]গৌর সরদার-এর কাছে থেকে প্রাপ্ত তথ্য। স্থান-কুলতলি।

[18]'লোক প্রমোদে সুন্দরবনের আদিবাসী লোকগান'- ডঃ সুভাষ মিস্ত্রী, www.srishtisandhan.com. Date- 18.4.19, পৃষ্ঠা- ৩।

[19]'বাংলা পাচালী সমূহঃ শ্রী শ্রী মা লক্ষ্মীর পাঁচালী'।

আবার, আমরা যদি টুসু পূজার উপাচারের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখবো যে দক্ষিন চব্বিশ পরগণার ভূমিজ জনসমাজে টুসু দেবীর পূজার উপাচার হিসেবে কি কি উপকরন দিয়ে পূজা করা হয়। নিচের গানটি হল তার একটি উদাহরণ।

৩. " কলা দিলাম সারি সারি,বেগুণ দিলাম সারি সারি।

এবারক যে গো মা টুসু, আর কিছু না দিতে পারি"।[20]

এই গানটির মধ্যে আমরা যেমন টুসু পূজার উপাচার হিসাবে কলা, বেগুণ-এর উল্লেখ পাচ্ছি, তেমনি আবার ভূমিজ জনসমাজের দারিদ্র্য ও অভাবের কথা ফুটে উঠতেও দেখি। সেই দারিদ্র্য ও অভাবের কথা নারীরা গানের মাধ্যমে টুসু ঠাকুরের কাছে জানায়।

সন্ধ্যারতির সময় 'টুসু' দেবীকে নিয়ে যে সন্ধ্যারতির গান গাওয়া হয় তা হল-

৪. "তেল দিলাম, সলতে দিলাম, এল ভগবতী।

গাই এল, বাছুর এল, এল দূর্গা সতী।

একে একে লে মা সন্ধ্যা লক্ষ্মী সরস্বতী"।[21]

এই সন্ধ্যারতি গানের মধ্যে দিয়ে ভূমিজ জনসমাজের নারীরা তাদের সুখ, আশা, আনন্দের কথা প্রকাশ করছে। এই প্রসঙ্গে হিন্দু বাঙালী সংস্কৃতির একটা প্রাচীন কুমারী ব্রত "তোষ- তোষলা" ব্রত গানের কিছু সাদৃশ্য আছে। নিম্নউক্ত উদাহরণ দুটিতে এই সাদৃশ্যের কথা চমৎকার ফুটে উঠেছে।

৫. "তুষ-তুঁষলি, তুমি কে।

তোমার পূজা করে যে।

ধনে ধানে বাড়ন্ত"।

আবার,

[20] 'লোক প্রমোদে সুন্দরবনের আদিবাসী লোকগান'- ডঃ সুভাষ মিস্ত্রী, পাতা- ৩।

[21]লতিকা সরদারের কাছে থেকে প্রাপ্ত। স্থান- কুলতালি, তারিখ- ২২/১১/২০১৮।

"গাইয়ের গোবর, সরষের ফুল।

আসনপিঁড়ি,এলোচুল"।[22]

৬. " টুসালু গো মাই টুসালু।

ধানে ধানে গাঁয়ে ভরালু।

তোমার পূজা করে যে।

নিত্য নিত্য ধনে বাড়ে যে"।[23]

অতএব আমরা যদি উপরিউক্ত দুটি গান পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব দুটি গানের বিষয়বস্তু একই। কেননা দুটি পূজাই করছে মেয়েরা। তাদের সুখ-দুঃখ, আশা- আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদ এই গান গুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। মেয়েরা তাদের নিজেদের সুখের জন্য, সংসারের সুখের জন্য এই পূজা করে। গান গুলিই হল তাদের এই পূজার মন্ত্র। এছাড়া "তোষলা" ব্রততে ব্যবহৃত উপাচারের সঙ্গে "টুসু" পূজায় ব্যবহৃত উপাচারের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন- গরুর গোবর, সরষে-ফুল, দূর্বা-ঘাস, প্রভৃতি।

টুসু গানের মধ্যে শুধু যে তাদের সুখ, আনন্দের কথা ফুটে উঠেছে তা নয়, গানের মধ্যে ভূমিজ জনসমাজের নারীদের দুঃখ-বেদনার করুণ চিত্রও ফুটে উঠেছে। যা এই গানের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হল-

৭. "ধান শিষটা এল তোলো।

আমার ভাই তো এলো না।

আমার ভাই এত নিষ্ঠুর।

একবার নিতে এলো না"।[24]

---

[22]'বাংলার ব্রত- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। পৃষ্ঠা নাম্বার- ২৯। নান্দীমুখ- বরুনকুমার চক্রবর্ত্তী।

[23]'ছত্রাক পত্রিকা'- 'টুসু পরব প্রবন্ধ'। ১৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৯১। shodhganga.inflibnet.ac.in, পৃষ্ঠা-২৫৩।

[24]মেনকা সরদারের কাছে থেকে প্রপ্ত। স্থান-কুলতালি, তারিখ-২২/১১/২০১৮।

এই উপরিউক্ত গানটির মধ্য দিয়ে ভূমিজ জনসমাজের পারিবারিক জীবনের নানা টুকরো টুকরো ছবি ধরা পড়েছে। যেখানে দেখা যায় একজন অল্প বয়সী গৃহ বধূর বেদনার সকরুণ চিত্র। কেননা এই পৌষ উৎসবের সময় ধান কাটা হয়ে গেছে এবং একই সঙ্গে পৌষ সংক্রান্তির উৎসবও শুরু হয়েছে, তথাপি এই বধূটিকে বাপের বাড়ি থেকে কেউ নিতে আসেনি। সেই চিত্রটিই এই গানের মধ্যে পরিস্ফুটিত হয়েছে।

রোদ বৃষ্টির মধ্যে বনে-জঙ্গলে যাদের বেঁচে থাকার জন্য রসদ সংগ্রহ করতে হয়; তাদের দেবতাকে তো নেমে আসতে হবে তাদের সঙ্গে বনে জঙ্গলে। সেই চিত্র উঠে আসছে টুসু গানে।

৮. "বড় বোনের লতা পাতা।/ ছোটো বোনের শাল পাতা।

কোন বনে হারালো টুসু।/সোনার বরণ লালছাতা।

চিড়কা রোদে ধরেছে"।[25]

টুসু বিসর্জনের পদ্ধতিঃ

আমরা যদি টুসু বিসর্জনের অনুষ্ঠান রীতি সম্পর্কে আলোচনা করি তাহলে দেখব সুন্দরবন তথা দক্ষিন চব্বিশ পরগনার ভূমিজ জনজাতির টুসু বিসর্জন রীতি ও পুরুলিয়ায় বসবাসকারী ভূমিজ জনজাতির টুসু বিসর্জন রীতি প্রায় একই। মকর সংক্রান্তির আগের দিন টুসু জাগরণের দিন। এই দিনে মেয়েরা সারারাত জেগে টুসু আরাধনায় মত্ত থাকে। মেয়েদের সঙ্গে ছেলেরাও গলা মিলিয়ে গান গাইতে থাকে। মেয়েরা সকালে টুসু দেবী কে বিসর্জন দিতে পুকুর বা নদী ঘাটে গান গাইতে গাইতে নিয়ে যায়। ছেলেদের দল ধামসা, মাদল, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে থাকে।[26]

---

[25] বাংলা সংস্কৃতি 'টুসু পরব'। লেখক- সোমেন দে, অবসর নেট ব্লগ। তারিখ- ১১/৪/১৯। পৃষ্ঠা-১।

[26]'ছত্রাক পত্রিকা' (১৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা), 'টুসু পরব' প্রবন্ধ, নবকিশোর সরকার, shodhganga.inflibnet.ac.in, পৃষ্ঠা-২৫৩।

বিসর্জনে ব্যবহৃত গান হল-

৯. "মোদের টুসু কাপড় কাচে, সোনা জরি লয়ে গো।

তোদের টুসু দেখে বলে, কোন গেরস্তের মেয়ে গো।

মোদের টুসু ভাজা ভাজে, শাঁখা ঝলমল করে গো।

তোদের টুসু রান্না ঘরে, মাছি ভন ভন করে গো"।[27]

উপরিউক্ত গানের মধ্যেদিয়ে ভূমিজ জনসমাজের নারীদের পোশাক ও অলংকারের কথা উঠে আসছে। এছাড়া এই গানের মধ্যদিয়ে একটা সময়ের কথা উঠে আসছে। যে সময়ে সমাজে টিকে থাকার ক্ষেত্রে ভূমিজ জনজাতির মানুষজন নিজেদের সমাজকে পরিত্যাগ করে হিন্দু ধর্মকে গ্রহন করছে। গানের মধ্যে যে সব অলংকারের প্রসঙ্গ উঠে আসছে তা মুলত হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নিদর্শন হিসাবে পরিচিত। সময়ের প্রথম দিকে ভূমিজরা হিন্দু ছিলনা। যার ফলে তাদের অলংকার হিসাবে সোনা, শাঁখা এবং পোশাক হিসাবে কাপড়ের উল্লেখ ছিলনা। কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার পরে শাঁখা, সিঁদুর, সোনা, কাপড় প্রভৃতিকে তাদের অলংকার হিসাবে গ্রহণ করেছে।

সুতরাং পরিশেষে বলতে পারি যে টুসু গানের মাধ্যমে ভূমিজ জনসমাজের নারীরা তাদের আশা, চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ কে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, তেমনি টুসু গানের আর একটি দিক হল যে টুসু গান হয়ে উঠেছিল মানভূমের মানুষদের কাছে আন্দলনের গান। মানভূমের বাংলা ভাষাকে বাঁচাতে টুসু গান কে তারা হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছিল। টুসু গান হয়ে উঠেছিলো মানভূমের বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার গান।[28]

করম পূজাঃ

করম পূজা হল টুসু পূজার মত কৃষি ভিত্তিক লোকায়ত সামাজিক উৎসব। কৃষি দেবতা করম ঠাকুরকে কেন্দ্র করে এই পূজা ভাদ্র মাসের শুক্লা পক্ষের একাদশী তিথিতে করা হয়। সুন্দরবন আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতিতে করম পূজা

[27]'লোক প্রমোদে সুন্দরবনের আদিবাসী লোকগান'- ডঃ সুভাষ মিস্ত্রী। www.srishtisandhan.com, date- 18/4/19. পৃষ্ঠা-৩।

[28] 'টুসু সত্যাগ্রহের আরেক দিক- আদিবাসীরাও নাকি বাঙ্গাল-ই ছিল', লালন কুমার মাহাত, February 5, 2019. www. Voiceofchotanagpur.com. পৃষ্ঠা-১।

একটি আনন্দমধুর উৎসব ও নৃত্যগীত অনুষ্ঠান। ভাদ্র মাস মূলত ফসল বোনার মাস। ফসল উৎপাদনের মঙ্গল কামনায় এই করম দেবতাকে পূজা করা হয়। এই পূজা ফসল উৎপাদনের কামনায় করা হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক প্রসঙ্গ ও রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ এর বিষয়বস্তু রূপেও বিবেচিত হয়।

করম পূজার পালন রীতিঃ

করম পূজার উদ্দেশ্য টুসু পূজার মতো হলেও করম পূজার পদ্ধতি একটু আলাদা। সুন্দরবনে করম গাছের অনুপস্থিতির কারনে "কদম্ব" কিম্বা "হাবাল"বৃক্ষকেই মান্যতা দেওয়া হয়। এই পূজাতে শপলার ফুল, ছাতা, কলাগাছ রাখা হয় এবং বালি ভর্তি একটি নতুন মালসায় বা সরায় ধান, যব, গম, কলাই, সরষে, হলুদ রেখে জল ছিটিয়ে দু-চার দিন রেখে দিলে অঙ্কুরোদগম হয়। এই "অঙ্কুরোদ্গম" মূলত নারীগনের সন্তান কামনার প্রতীক হিসাবে দেখা হয়। এই পূজার পদ্ধতির সঙ্গে মানভূমের "জাওয়া" পূজার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

নির্দিষ্ট দিনে কদম্বের ডাল কেটে এনে উঠোনে পুঁতে দেওয়া হয় এবং পাশে রাখতে হয় পূর্বের উক্ত অঙ্কুরের মালসা বা সরা। করম বা কদম্বডাল কাটার বিধি-নীতি বিশেষ ধরনের। ভূমিজ জনজাতিদের নিজস্ব পুরোহিত থাকে, এই পুরোহিত সারাদিন উপবাস করে মূল করম বা কদম্ব বৃক্ষের গোড়ায় স্থাপন করেন নতুন গামছা আর পাঁচ সিকি পয়সা। করম পূজার সময় কুমারী কন্যারা এই করম বা কদম্ব গাছের চারি দিকে ঘুরে ঘুরে নৃত্যগীত করে আর পুরুষেরা মাদল বাজায়। এই পূজার সঙ্গে আদিবাসীদের আত্মার সম্পর্ক আছে। করম গাছ হল করম ঠাকুরের প্রতীক, সরা বা মালসা ভরা বালি হল পৃথিবীর প্রতীক এবং অঙ্কুরোদগম বীজ হল শস্য উৎপাদন বা সন্তান কামনার প্রতীক।[29]

করম পূজার গানঃ

"কর্ম"থেকেই 'করম' কথাটি এসেছে। 'করম' পূজা হল কৃষি ভিত্তিক একটি লোক উৎসব। 'টুসু' পূজার মতো এই 'করম' পূজা ও ভূমিজ কৃষক সমাজের কাছে একটি গুরুত্ব পূর্ণ উৎসব। ভাদ্র মাসের করম একাদশীর দিনে 'করম' বা 'কদম্ব' বৃক্ষের ডাল এনে কোন গৃহস্থ বাড়ির উঠানে কিম্বা গ্রামের আখাড়ায় সেটিকে পুঁতে মেয়েরা ফুল, বেলপাতা, প্রভৃতি দিয়ে পূজো করে এবং এই করম ডালকে ঘিরে

[29]মঙ্গল সরদারের কাছে থেকে প্রপ্ত তথ্য গৃহীত হয়েছে। স্থান-উত্তর মোকামবাড়িয়া ।

মেয়েরা দলবদ্ধ ভাবে নাচ-গান করতে থাকে। আর ছেলেরা মাদল,ধামসা, বাঁশি বাজিয়ে মেয়েদের সাথে নাচতে থাকে। এই নাচকে 'করম' নাচ এবং এই 'করম' ঠাকুরকে ঘিরে যে গান করা হয় তাকে 'করম গান' বলে। এই করম ঠাকুরের গান গুলি মূলত অবিবাহিত কুমারী মেয়েরাই করে থাকে। তবে এখন এই গান ছেলেরাও গায়। মনের আবেগে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে করম ঠাকুরের কাছে নিজেদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, চাওয়া-পাওয়ার কথা গানে গানে প্রকাশ করে থাকে। যার কারনে এই গান গুলির সামাজিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না।[30]

সুন্দরবনে ভাদ্র মাস বড়োই অভাবের মাস। প্রাক শারদীয়ার এই সময়ে কাজ থাকে না, ফলে কোন উপার্জনও এই সময় হয় না। এই সময় তারা শালুক খেয়ে জীবন ধারন করে। যা এই গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছে।

১০. "শালুক খেয়ে দাঁত ও কালো।

লোকে বলে আছেন ভালো।

বলি দিদি লো, দিদি লো।

সকালে শালুক সিঁজাইলো"।[31]

ভাদ্র মাস যেহেতু অভাবের মাস। তাই এই সময় ক্ষেতের শালুক প্রভৃতি খাদ্য খেয়ে তারা জীবন ধারন করে। তাই এই গানের মধ্যে দিয়ে ভূমিজ জনসমাজের কৃষক পরিবারের অভাব-অনটনের একটা চিত্র ফুটে উঠেছে।

এই করম গান গুলির মধ্যে একদিকে হাসি-কান্না, দুখ-দুঃখ, অভাব-অনটনের কথা যেমন ফুটে ওঠে। তেমনি অন্যদিকে গান গুলির মধ্যে গভীর জীবন দর্শনেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

---

[30]লোক প্রমোদে সুন্দরবনের আদিবাসী লোকগান- ডঃ সুভাষ মিস্ত্রী।www.srishtisandhan.com>content, date-18/4/19. পৃষ্ঠা- ৫।

[31]গানটি ভারতী সরদারের কাছে থেকে গৃহীত হয়েছে। স্থান- চাতরাখালি, তারিখ-১০/০২/২০১৯।

১১. "সাঁঝে ফুটে ঝিঙাফুল, সকালে মলিন।

আজ কেনে বঁধুর, বদন মলিন হে?।

সাঁঝে ফুটে ঝিঙাফুল, সকালে মলিন"।[32]

অর্থাৎ এই গানের মধ্যে দিয়ে মানব জীবনের গভীর জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে। ঝিঙাফুলের সৌন্দর্য যেমন ক্ষণস্থায়ী, মানব জীবনও তেমনি ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে আনন্দময় করে তোলাই মানব জীবনের অন্যতম লক্ষ্য।

আবার যদি আমরা এই গানটার দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, যে এই গানটিও করম গানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পুরুলিয়ার একটি "জাওয়া" গানের অনুরুপ। গানটি হল-

১২. "ঝিঙা তুললাম ডালি তালি আর-অ কত জালি লো।

শিশু ছাইলার বেহা দিঞে অন্তর হৈল খালি লো"।[33]

এই গানটি ও একটি মানব জীবনের গভীর জীবনদর্শনের গান। এই গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে নারীর জীবনের করুন বেদনার চিত্র। একজন নারীর কাছে মূল্যবান হল তার সন্তান। এই গানের বিষয়বস্তু হিসাবে কন্যা সন্তানের কথা বলা হয়েছে। আর সেই কন্যাকে বিয়ে দিলেই তো অন্তর শূন্য হয়ে যাবে। কেননা এজন্মে তো আর গর্ভে কন্যা সন্তান হবে না। তাই এই গানে একজন নারীর জীবনের করুন চিত্র ফুটে উঠেছে।

এই গান গুলির মধ্যে যেমন মানব জীবনের জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে, তেমনি আবার মানব জীবনের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের গান হিসাবেও এই গানগুলির মূল্য অপরিসীম।

---

[32]'করম পরব-লোটাকম্বল', ফাল্গুনী ঘোষ , সেপ্টম্বর ৩, ২০১৮। http:/lotakambal.com> করম-পরব। পৃষ্ঠা- ১।

[33]'যুক্তিবাদী' পত্রিকা, প্রবন্ধ- ব্রাত্যজনের রোদন সঙ্গীত, নলিনী বেরা, www.srai.org>juktibadi-january-09, date-30/12/2008.Pg-33.

১৩. "দাও দাও কৃষ্ণ চোরা বসনও আমারে।

উলোঙ্গিনী হয়ে আছি মোরা জলেরও ভিতরে।

দাও দাও কৃষ্ণ চোরা বসনও আমারে।

কোথায় ছিল চোরা কৃষ্ণ, চুরি করে হায় হায়"।[34]

এই গানটি একটি রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গান। গানটি গাওয়া হয়েছে মূলত ঝুমুর গানের আঙ্গিকে। করম গান করম ঠাকুরকে নিয়ে গাওয়া হলে ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে ও গান বাঁধা হয়।

করমের একটি গানের মধ্যে মেয়েদের আশা-আকাঙ্খা, চাওয়া-পাওয়ার কথা ফুটে উঠেছে। যে গানের বন্দনার মধ্যে করম ঠাকুরকে ডাকা হচ্ছে। যাতে ফসলের উৎপাদন ভাল হয় সেই আশাতে মেয়েরা করম ঠাকুরকে ঘিরে গান করছে। গানের মধ্যে 'করম ঠাকুর' কে বর্ষার দেবতা হিসবেও দেখা হচ্ছে। বর্ষা এলে ফসল ভাল হবে সেই আশা-আকাঙ্খা এই গানে প্রকাশ পাচ্ছে।

১৪. "করম কাটি করম কাটি আখাড়ায় স্থান করি।

সবে জারি দিল গো রেশমের বাতি।

হায়রে করম বাতি, হামাদের করম রাতি।

নাচিনাচি মাহামাহি।।

শিশিরে কি ধান ফলে বিনা বরিষণে।

শোনা কথায় মন ভুলে না বিনা দরশনে"।।[35]

[34]গৌর সরদারের কাছে থেকে গৃহীত গানটি। স্থান-কুলতলি, তারিখ-০৪/০২/২০১৯।

[35]লোক প্রমোদে সুন্দরবনের আদিবাসী লোকগান- ডঃ সুভাষ মিস্ত্রী। পৃষ্ঠা-৫।

করম পূজার বিসর্জনের গানঃ

পূজার রাত্রি শেষে করম ঠাকুরকে বিসর্জন দেওয়া হয়। সারা রাত পূজার সাথে নাচ-গান করে ক্লান্ত শরীরে মেয়েরা গান করতে করতে চলে আর ছেলেরা চলে মাদল বাজাতে বাজাতে। কদম্ব ডাল ও অঙ্কুরিত বীজের সরা-মালসা মাথায় করে নেয় বয়সজ্যেষ্ঠ প্রধানেরা।নদীর বা পুকুরে ঘাটে করম দেবতাকে বিসর্জন দেওয়া হয়। বিদায় বেলাতেও গানের বিরাম নেই। এমন একটি গান হল-

১৫. " হামাদের করম যাছে শহরে, আবার এসো গো।

বাটা ভরে পান দেবো, খেয়ে যেয়ো গো"।[36]

এই গানটার মধ্যে একটা আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট। 'শহর' ও 'পান' এই দুটি শব্দের মধ্যদিয়ে তা বোঝা যাচ্ছে। তখনকার দিনে পান খাওয়ার মধ্যদিয়ে আভিজাত্যের ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একটা সময়ের চিহ্ন উঠে আসছে গানের মধ্যে। একটা সময়ে তারা শহরে আসছে এবং শহরের মানুষদের চাল চলনকে তারাও অনুকরন করার চেষ্টা করছে যা এই গানে দেখা যাচ্ছে।

গ্রাম পূজার গানঃ

সুপ্রাচীন এবং আদিম সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক সময়ে জঙ্গল গুলি মানুষের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করেছিল। প্রতিকূল পরিবেশ ও বন্য জীব-জন্তু সুন্দরবনের মানুষের মধ্যে ভয়ের একটা অনুভূতি তৈরি করেছিল। কিন্তু এই ভয়ের অনুভূতি থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে বনদেবতা সম্পর্কে সম্ভ্রমপূর্ণ ও বিস্ময়কর একটা ধারনা তাদের মধ্যে জন্ম নিল। সুন্দরবনের মানুষজন মনে করে প্রতিকূল পরিবেশ এবং বন্য পশুদের আক্রমন থেকে এই দেবতা তাদের রক্ষা করবে।

প্রতিটি দেশে প্রথমিক ভাবে আদিম লোকবিশ্বাসগুলি উৎপন্ন হয়েছিল মূলত লোককাহিনী ও পৌরানিককাহিনীকে কেন্দ্র করে। যেগুলি জড়িত ছিল এই বনদেবতা গুলির সাথে। এই একই সময়ে সুন্দরবনেও এটা ঘটেছিল। সুন্দরবন এলাকার সমাজজীবন মূলত গ্রামপ্রধান। সমুদ্র, নদী-খাল,ও বন-জঙ্গল পরিবেষ্ঠিত এই অঞ্চলের মানুষ প্রধানত কৃষিজীবী, বন এবং জলের উপর নির্ভর করে জীবীকা অর্জন করে। প্রাকৃতিক সম্পদই ছিল এখানকার শ্রমজীবী মানুষদের

[36]ভারতী সরদারের কাছে থেকে প্রাপ্ত। স্থান-চাতরাখালি, তারিখ-১০/০২/১৯

জীবন ধারনের একমাত্র রসদ। তাই এখানকার মানুষ জীবন থেকে মৃত্যু সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে বনদেব-দেবী এবং পীর-গাজীদের ওপরই নির্ভর করে।যে কারনে বনবিবি সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষদের আরধ্য দেবতা। মুসলমান এবং হিন্দুরা নিজেদের মতো করে দেবীকে উপাসনা করে। এখানকার মানুষ তাদের নিজস্ব ধর্ম অনুসারে দেব-দেবীদের পূজা করে এসেছেন নিজের কল্যাণের জন্য।[37]

সুন্দরনে অন্যান্য জনজাতির বসবাসের পাশা-পাশি আদিবাসী জনজাতির মানুষজনও বসবাস করত। এই আদিবাসী জনজাতি গুলির মধ্যে একটি হল ভূমিজ জনজাতি। সুন্দরবন তথা দক্ষিনবঙ্গে বসবাস কারী ভূমিজ জনসমাজের একটি উল্লেখযোগ্য পূজা হল গ্রাম পূজা। এই পূজার নির্দিষ্ট কোন দিন নেই তবে মাঘ মাসের শেষের দিকে এই পূজা করা হয়। এই পূজা করা হয় মূলত গ্রামের সকল মানুষের কল্যাণের জন্য। গ্রাম পূজাতে পূজিত হয় বনবিবি, শীতলা, মাসান ও তুলসী পীর-এই দেব-দেবীগন। এই সব দেব-দেবীর পূজার মাধ্যমে তাদের কাছে প্রার্থনা জানানো হয় যে গ্রামের সকল মানুষ যাতে ভালো থাকে, সুস্থ থাকে।

পূজা করার জন্য গ্রামে একজন পুরোহিত থাকে, তিনি এই পূজা করে থাকেন। পূজা করার ক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতি পালন করতে হয়। যেমন মাটির সরাতে করে চালের নাড়ু দেওয়া, বাঁশ পুঁতে তার উপর লাল ঝাণ্ডা লাগানো ইত্যাদি। শেষে পুরোহিত এই পোঁতা বাঁশের উপর ওঠে বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ করেন। দেব-দেবীদের পূজার উপকরণ হিসাবে মুরগি, শূকোর, ছাগল, পান-সুপারি, সন্দেশ-বাতাসা, চাল এবং মদ্য দেওয়া হয়।[38]

বনবিবি কে নিয়ে একটি গান হল-

১৬. “ আঁটি সাঁটি মাটি কাটি।

নদী কেন টল-মল করে গো।

ওগো বনবিবি”।[39]

---

[37]The sundarbans: Folk and Folk Religion, Rafiqul Islam Khokan, http:/www.academia.edu.

[38]মঙ্গল সরদারের কাছে থেকে তথ্যটি গৃহীত হয়েছে। স্থান- উত্তর মোকামবেড়িয়া।

[39]নির্মল সরদারের থেকে সংগৃহীত হয়েছে। স্থান-কুলতলি, তারিখ-২২/১১/২০১৮।

এই গানের মধ্যে বনবিবির কাছে প্রার্থনা জানানো হচ্ছে যে, বনবিবি যেন তাদের রক্ষা করে। সুন্দরবনের মানুষ মূলত শ্রমজীবী। তাই তারা জঙ্গল কেটে চাষ যোগ্য করে তোলার সময় বহু সমস্যার সন্মুখীন হয়েছিল। সেই সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে তাঁদের কাছে একমাত্র সহায় এই বনদেবী।

সহরাই পূজাঃ

'সহরাই' পূজা হল মূলত বন্দনামূলক। গো-বন্দনা করাই হল এই পূজার বিষয় বস্তু। প্রতিটি কৃষক পরিবারে এই পূজা পালন করা হয়। আমাদের মতো কৃষি প্রধান দেশে কৃষিসংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুকে পবিত্র হিসাবে মানা হয়। সুন্দরবন যেহেতু কৃষি প্রধান এলাকা সেহেতু এখানে এই 'সহরাই' পূজার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। দক্ষিন চব্বিশ পরগণাতে এই পূজাকে 'সহরাই' পূজা বলে। অন্যদিকে ঝাড়খণ্ড, মানভূম প্রভৃতি জায়গায় ওই একই পূজা 'বাঁধনা' পরব; আবার কোন কোন জায়গায় এই পূজা গরুখুঁটা বলেও পরিচিত। গরুর সেই খুঁটোকে পূজো করে মুর্গী বলি দিয়ে দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়।[40] এই পূজার মধ্য দিয়ে কৃষক পরিবারের লোকজন গো-দেবী ভগবতীর কাছে প্রার্থনা জানায় যে তাদের সংসারে যেন কোন অভাব না থাকে। গরু, বাছুর, ছেলে-মেয়ে, বাড়ির সকলের মঙ্গল কামনায় ভূমিজ জনজাতির কৃষক পরিবার এবং হিন্দু কৃষক পরিবার এইগোয়াল পূজা করে থাকে।

সহরাই পূজার পালনরীতিঃ

আমরা যদি এই পূজার পালনরীতি সম্পর্কে সুন্দরবন এবং মানভূম এই দুই জায়গার একটু তুলনামূলক আলোচনা করি তাহলে দেখা যাবে মানভূম, পুরুলিয়া, প্রভৃতি জায়গায় এই পূজা কে পরব হিসাবে পালন করা হয়। কিন্তু সুন্দরবন তথা দক্ষিনবঙ্গে এই পূজা কে গরুর-দেবতা তথা ভগবতী-দেবীকে পূজো করা হয়। পুরুলিয়া, মানভূম, সাঁওতাল পরগনা প্রভৃতি জায়গায় এই পূজার আগের দিন সমস্ত গৃহে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। ঘরের বউ, মেয়েরা ঘর, উঠান,

[40]'সীমান্ত বাংলার লোকযান" ,১৩৭১, সুধীরকুমার করন। MB4824, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭০।

সমস্ত কিছু গোবর জল দিয়ে পরিস্কার করে। বাড়ির উঠানে,দেওয়ালে, নানা রঙের আলপনা আঁকে। তার পর গরু কে স্নান করনো , সন্ধ্যার সময় বাড়ির গৃহিনীরা গরুর মাথায় তেল, সিঁদুর ইত্যাদি মাখিয়ে দেয়। এছাড়া গোয়াল ঘরে দু-মুঠো খড়, ঘাস ফেলে রেখে দেয়। এরপর রাতে গৃহিনীরা ধান-দূর্বা- তুলসী দিয়ে বন্দনা করে। আর চার- পাঁচদিন ধরে এই পরব চলে।[41]

এবার আমারা যদি এই সহরাই পূজা পালনের রীতি প্রসঙ্গে সুন্দরবনের দিকে তাকায় তাহলে দেখব, গরু দেবতাতুল্য হওয়ার ফলে গোয়াল ঘর তাদের কাছে হয়ে ওঠে পূজার বেদী। গোয়াল ঘর ভাল করে ঝেড়ে-মুছে পরিস্কার করে চারদিকে বসানো হয় মঙ্গলঘট ও কলাগাছ। সমস্ত গরু-বাছুর কে তেল-হলুদ-সিঁদুর মাখিয়ে স্নান করানো হয়। তারপর প্রধান গরুর লেজে, শিঙে, পিঠে তেল-হলুদ মাখিয়ে কপালে সিঁদুর টিপ দিয়ে গলায় শালুক ফুলের মালা, বেল ও আম পাতার মালা পরানো হয় এবং গরুকে ঘিরে পাঁচ-সাত বার প্রদক্ষিণ করার সময় গরুর পায়ে জল দিয়ে প্রণাম করতে হয়। এই পূজা করা হয় ভাদ্রের ‘গোমা’ পূর্ণিমা তিথি ও কার্তিক অমাবস্যার তিথিতে। এখান কার ভূমিজ জনজাতি এবং অন্যান্য আদিবাসী জনজাতি রাত্রির তৃতীয় বা চতুর্থ প্রহরে পূজা করে। কিন্তু হিন্দু বাঙালীরা পাঁজি দেখে দিন-ক্ষণ মিলিয়ে এই পূজা করে।[42]

পূজার উপাচারঃ

‘সহরাই’ পূজার নৈবেদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় দুগ্ধজাত ক্ষীর-ছানা, আমপাতা, বেলপাতা, দূর্বাঘাস, শালুক ফুল, প্রভৃতি এবং আদিবাসীরা নৈবেদ্য হিসাবেও হাঁড়িয়া, মদ প্রভৃতি ব্যবহার করে। এই পূজা করার জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন তেমন পড়ে না, গৃহের কর্তা বা কর্ত্রী পূজা করে। তবে ভূমিজ জনসমাজে এই পূজার জন্য একজন পুজারী থাকে তাকে ‘পাহান’ বলা হয়। এই পাহান কে ধূতি, গেঞ্জী, পান, হাঁড়িয়া উপহার হিসাবে দেওয়া হয়।[43]

---

[41]‘ছত্রাক পত্রিকা’,(৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৯৭৮, ২য় ও ৩য় সংখ্যা), প্রবন্ধ-‘ মানভূমের পরব পাইল’(বাঁদনা পরব) মহাবীর নন্দী, shodhganga.inflibnet.as.in পৃষ্ঠা-২৫০।

[42]‘লোক প্রমোদে সুন্দরবনের আদিবাসী লোকগান’- ডঃ সুভাষ মিস্ত্রী। www.srishtisandhan.com. Date-18/4/19. পৃষ্ঠা-২

[43]মঙ্গল সরদারের কাছে থেকে তথ্যটি সংগৃহীত হয়েছে। স্থান-উত্তর মোকামবেড়িয়া।

সহরাই পূজার গানঃ

'গোয়াল পূজা' বা 'সহরাই' পূজার জাগরণ রাতে ভূমিজ জনসমাজের কৃষক পরিবারের মানুষজন হাঁড়িয়া, মদ সেবন করে, মাদল বাজিয়ে নাচ-গান করে। এই নাচ গানের মাধ্যমে দেবী ভগবতীর কাছে বাড়ির সকলের জন্য কল্যাণ কামনা করা হয়। পুরুলিয়া, মানভূম, ঝাড়গ্রাম, প্রভৃতি জায়গায় এই 'সহরাই' বা 'গোয়াল পূজার' গান ' অহিরা' গান নামে পরিচিত। 'সহরাই' পূজার একটি বন্দনা মূলক গান হল-

১৭. "জাগো মা ভগবতী, জাগো মা লছমনি।

জাগেত অমাবস্যার রাতিরে।

জাগে কা অশিস, দেবে মা গো ভগবতী।

পাঁচ পুতা দশ ধেনু গাই"।[44]

এই গানটা হল গো-দেবী ভগবতীর বন্দনা মূলক গান। গানের মধ্য দিয়ে তারা গরু কে জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। এই গানটির মতো আরো নানা গানে আমরা লক্ষ্য করি ভূমিজ জনজাতি তাদের গৃহস্থে পঞ্চ পুত্র ও দুগ্ধবতী গাভির জন্য তাদের আরাধ্য দেবীর কাছে প্রার্থনা করছে। বাড়ির কর্তা বা কর্ত্রী নিজেদের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্যও দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাই। যা এই গানে প্রকাশ পেয়েছে-

রাখালগন সম্পর্কিত একটি গান হল-

১৮. "কাটরে কলার পাত, আনরে ব্যঞ্জনের ভাত।

রাখাল গন বসে আছে সারি সারি।

পাল তোলো ওরে সুদাম, শৃঙ্গা দাওনি সারি।

বেলা তো আর নেই বেশী, বসে আছে দ্বন্দ্ব চারি"।[45]

---

[44]'লোকপ্রমোদ সুন্দরবনের আদিবাসী লোকগান'- ডঃ সুভাষ মিস্ত্রী। www.srishtisandhan.com , তারিখ-১৮/৪/১৯। পৃষ্ঠা-২

[45]গান নির্মল সরদারের কাছে থেকে গৃহীত। স্থান-কুলতলি, ২২/১১/২০১৮।

এই সহরাই পূজা গরুর মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে করা হয় আর এই গরুর সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে রাখালের সম্পর্ক। উপরিউক্ত গান তারই প্রকাশ। গানের মধ্যে রাখালদের বলা হচ্ছে-বেলা আর বেশী নেই, তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে; দেরী হলে শাস্তি দেওয়ার জন্যে মালিক বসে আছে। এই রাখাল আর গরুর সম্পর্ক অতি প্রাচীন। তাই পূজাতে রাখালরা নিমন্ত্রিত থাকে এবং তাদের কে সামর্থ অনুযায়ী কিছু পয়সা দেওয়া হয়।[46]

আষাঢ়ী পূজাঃ

'আষাঢ়ী' পূজা হল দক্ষিন চব্বিশ পরগণাতে বসবাসকারী ভূমিজ জনসমাজের একটি বিশিষ্ঠ পূজা। এই পূজা করা হয় আষাঢ় মাসে। 'আষাঢ়ী' পূজা করা হয় মূলত প্রকৃতি দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং ভূমিজ জনজাতির পূর্ব-পুরুষদের আত্মার স্মরনে।

পূজার নৈবেদ্যঃ

এই 'আষাঢ়ী' পূজার নৈবেদ্য হিসাবে আত্মার শান্তি কামনার জন্যে নিবেদন করা হয় ষাঁড়া(বাছা মোরগ), মুরগি, মোরগ,শূকর, পাঁঠা ছাগল, পিঠে, মদ প্রভৃতি।[47]

আষাঢ়ী পূজার গানঃ

'আষাঢ়ী' পূজার গান গাওয়া হয় মূলত তাদের পূর্ব পুরুষদের আত্মার শান্তি কামনা করে। এই গান কেবল মাত্র পুরুষরাই গেয়ে থাকে। গান গাওয়া হয় রাত্রিতে ঢোল সহযোগে। পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে গাওয়া একটি গান হল-

১৯. "খজাতে খজাতে এলি, পুছাতে পুছাতে ও।

ভলারাম কে ঘেরা কেতে দুয়ার মে।

নেই মাগিও গোটা রুটি।

---

[46]তথ্য নির্মল সরদারের কাছে থেকে গৃহীত।স্থান-কুলতলি।

[47]তথ্য সংগৃহীত হয়েছে মঙ্গল সরদারের কাছে থেকে।স্থান-উত্তর মোকামবেড়িয়া।

নেই মাগিও আধা রুটি।

নেই এলি মদের লোভে।

নেই এলি পিঠাকে লোভে"।[48]

এই গানটি হল ভূমিজ জনসমাজের পূর্ব পুরুষদের আত্মার শান্তি কামনার উদ্দেশ্যে গাওয়া একটি গান। এখানে দেখা যাচ্ছে পিঠে, মদ, শূকর, মোরগ দিয়ে তাদের আত্মার কাছে প্রার্থনা করছে যাতে তারা বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায়। এই পূর্ব পুরুষদের আত্মা তাদের কাছে প্রকৃতি দেবতা হিসাবে পূজিত হয়।

ঝুমুর গানঃ

'ঝুমুর'গান কোন নির্দিষ্ট উৎসব বা পূজা-পার্বণের গান নয়। তবে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসব–অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন পালা-পার্বণে এই গান গাওয়া হয়। 'ঝুমুর' গান মূলত পুরুলিয়া, মানভূম, রাচি, সাঁওতাল পরগনার গান হলেও, সুন্দরবনে বসবাসকারী কৃষিজীবী, শ্রমজীবী আদিবাসী জনজাতির জীবন সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। অনেকে মনে করেন এই 'ঝুমুর' কথাটি এসেছে 'ঝুমচাষ' থেকেই। ঝুমুর গান মানেই যে শৃঙ্গার রস বহুল গীত তা কিন্তু নয়, ঝুমুর হল এক প্রকার সঙ্গীত যা অন্য এক সঙ্গীত জগতের পরিচয় বহন করে। অর্থাৎ ঝুমুর হল আদিবাসী লোকসমাজের জীবন সঙ্গীত। তবে আমাদের আলোচনার বিষয় হল কি ভাবে ঝুমুর গানের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবন তথা দক্ষিনবঙ্গের ভূমিজ জনজাতির লোকসংস্কৃতি প্রকাশ পেয়েছে তা দেখা। এই 'ঝুমুর' গানে আদিবাসী সমাজ জীবনের টুকরো টুকরো চিন্তা-চেতনা, জীবন-জীবীকা, লৌকিক প্রেম-ভাবনা, নৈতিক কথা, রাম কাহিনী, প্রভৃতি কাহিনীকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই দিক থেকে এই ঝুমুর গানের সামাজিক গুরুত্ব কে অস্বীকার করা যায় না।

সুন্দরবনে এই ঝুমুরের পাঁচটি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। যথাক্রমে- নাচনী ঝুমুর, খেমটা ঝুমুর, দাঁড়শালিয়া ঝুমুর, আধ্যাত্মিক ঝুমুর, ব্যাঙ্গাত্মক ঝুমুর। তবে এই সব আমাদের আলোচনার বিষয় নয়, আমাদের আলোচনার বিষয় হল

[48]গানটি গৃহীত হয়েছে গৌর সরদারের কাছে থেকে। স্থান-কুলতলি, তারিখ-০৪/০২/২০১৯।

এই ‘ঝুমুর’ গানের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবন তথা দক্ষিন চব্বিশ পরগণার ভূমিজ জনজাতির লোকসংস্কৃতি কে তুলে ধরা।[49]

ঝুমুর গান পুরুষ-মহিলা উভয়েই গেয়ে থাকে।এই গানে ব্যবহৃত বাদ্য যন্ত্র হল মাদল, বাশি, খোল করতাল, ঘুমুর। আমরা দেখব কিভাবে গান গুলির মাধ্যমে ভূমিজ জনসমাজের ছবিকে তুলে ধরেছে।

যেমন এই গানটি-

২০। “বন জঙ্গল কাটি কুটি।

চাষ করি গো আদিবাসী।

ফাঁকি জুকি দেলাইও,

মোর বাঙালী জাতি।

হানি হেকি বোকা আদিবাসী।

মদের বাটি গো ভালোবাসি।

হায় রে হায় গো হায়”।[50]

২১। “হায় রে সাধের হাঁড়িয়া।

জমি নিলি কাড়িয়া।

জমিদার বাবু রে।

দুটি টকার মদ খেতে দে।

মন আমার ভালো নয়”।[51]

---

[49]‘লোকপ্রমোদ সুন্দরবনের আদিবাসী লোকগান’- ডঃ সুভাষ মিস্ত্রী। www.srishtisandhan.com . date- 18/4/19.পৃষ্ঠা-8

[50]তপন সরদারের থেকে সংগৃহীত। স্থান-কুলতলি, তারিখ- ২২/১১/২০১৮।

[51]মঙ্গল সরদারের গাওয়া এই গানটি।স্থান-উত্তর মোকামবেড়িয়া, তারিখ-২৬/০২/১৯।

উপরিউক্ত গান দুটি হল ঝুমুর গান। এই গান দুটিতে আদিবাসী সমাজের একটা সময়ের শোষণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে তৎকালীন জমিদাররা নিপীড়িত আদিবাসীদের জমি-জায়গা কেড়ে নেওয়ায় তারা নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ অভুক্ত এই আদিবাসী প্রজারা মদ, হাঁড়িয়া ইত্যাদি বিষ জাতীয় খাবার খেয়ে নিজেদের জীবন সংশয় করে তুলছে। শেষে বাধ্য হয়ে জমিদারের কাছে হাত পাততে হচ্ছে। শাসক ও শোষিতের এই চিরন্তন চিত্রটি এই গানটিতে আমরা লক্ষ্য করি। আরো একটা ছবি পাচ্ছি যে সময়ে আদিবাসীরা বন-জঙ্গল কেটে চাষ-বাস করছে এবং তাদের খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে হাড়িয়া, মদ ইত্যাদির উল্লেখ আছে।

ঝুমুর গানের মধ্যে সুন্দরবনের ভূমিজ জনজাতির এবং অন্যান্য আদিবাসী জনসমাজের জীবন জীবিকার কথা যেমন পাচ্ছি, তেমনি তাদের পরিবারের দুঃখ, অভাবের চিত্র ফুটে উঠেছে। এমন একটি গান হল-

২২. "সুগারে মাই এ জ্বালা আর কত সহিব।

চল সুগা বিদেশে যাব।

সুগারে মাই এ জ্বালা আর কত সহিব।

গামছা বিছায়ে ভাত খাব।

তবু না পরের অধীন হব"।[52]

এই গানটার মধ্যে আমরা একটি পরিবারে দুঃখ-দুর্দশার চিত্র দেখতে পায়। পরের অধীনে না থেকে স্বাধীন ভাবে কাজ করার এই চিত্রটি। এই গানের মধ্যে শোষিত সমাজের কথা উঠে আসছে যার ফলে সেই সময়ের একটা সমাজ ব্যবস্থার সম্পর্কে একটা ধারনা পাওয়া যায়।

গান গুলির মধ্যে দিয়ে যেমন দুঃখ, অভাব, শোষনের ছবি ফুটে উঠেছে তেমনি, আবার গান গুলোর মধ্য দিয়ে একটি পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ভাবনা মূলক বিচ্ছেদের কথাকে তুলে ধরেছে।

[52]নির্মল সরদারের কাছে থেকে সংগৃহীত হয়েছে। স্থান-কুলতালি, তারিখ-২২/১১/১৮।

২৩. “তাল গাছে শুঁয়ো পোকা।

এটা নাকি বাবুর কাকা।

বল না বাবু তোর কাকা কে।

কি দোষে ছাড়িল আমাকে”।[53]

গানগুলির মধ্যে যেমন ভাবে আদিবাসী সমাজের দুক্ষ-দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে তেমনি আবার আনন্দের এবং প্রেম ভাবনাও ফুটে উঠেছে। গানে এই প্রেম ভাবনা রাম- সীতার কাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

২৪। “আম পাতার মাথায় রঙ।

দেখিলে জুড়ায় গো মন।

জাম পাতার মাথায়, কালো চুলের জটা।

ওরে সিথের সিঁদুর।

দেখিলে না ধরা যায়, না ধরিলে প্রাণ যায়।

সোনার হরিন গেল কত দূরে।

রাম সীতা আছে বনেরও ভিতরে”।[54]

২৫। “ও তুই ছেড়ে দে রাবন।

মা মা বলে বাছা কাঁদে যে লক্ষণ।

রাম ঘোরে রনে বনে, লক্ষণে পড়েছে ধরা ভাইরে”।[55]

সুতরাং আলোচনার পরিসমাপ্তিতে এসে আমরা দেখলাম ভূমিজ সমাজজীবনের সাথে গানগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গান গুলির মধ্য দিয়ে তাদের চাওয়া-পাওয়া,

---

[53]ভারতী সরদারের গাওয়া এই গানটি।স্থান-চাতরাখালি, তারিখ- ১০/২/১৯।

[54]ভারতী সরদারের কাছে থেকে নেওয়া এই গানটি। স্থান-চাতরাখালি, তারিখ-১০/০২/১৯।

[55]নির্মল সরদারের কাছে থেকে এই গানটি সংগৃহীত। স্থান-কুলতলি,তারিখ-২২/১১/১৮।

আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ, বিরহ-প্রেম প্রভৃতি সম্পর্কিত বিষয় গুলি প্রকাশ পেয়েছে। ভূমিজ বা অন্যান্য আদিবাসী সমাজের উৎসব, পূজা-পার্বণ গুলি যে তাদের জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে আছে; এই গান গুলি হল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অতএব গানগুলি যেমন ভূমিজ জনসমাজের জীবন-জীবিকা কে তুলে ধরেছে, তেমনি একই সঙ্গে তাদের সংস্কৃতির চিত্রও পাঠকের সন্মুখে তুলে ধরেছে। ফলে লোকায়ত সমাজজীবনে এই গান গুলির সামাজিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

তৃতীয় অধ্যায়

ভাষাসংস্কৃতি ও অলঙ্কার

ভারতবর্ষ যেমন বৈচিত্রময় দেশ, তেমনি এখানে বিভিন্ন ধরনের ভাষা-ভাষীর লোক বসবাস করে। একটি লোকায়ত সমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয় যেমন সেই সমাজকে জীব-জগতের ও পাঠকের সন্মুখে তুলে ধরতে সাহায্যকরে, তেমন ভাবে ভাষা ও একটি সমাজের বা একটি জাতির পরিচয় প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করে।এই ভাষা সংস্কৃতিক সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ভাষা সম্পর্কিত কিছু তথ্য আলোচনা করা দরকার।

ভাষা সম্পর্কে ভাষা বিজ্ঞানীরা তাঁদের বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যেমন ভাষাবিজ্ঞানী চার্লস এফ হকেট বলেছেন- " ভাষা হচ্ছে মানুষের এমন এক অন্যন্যসুলভ বৈশিষ্ট্য যা অন্য প্রাণী থেকে মানুষকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে ; এবং তার স্বাতন্ত্র্যের এই অভিজ্ঞাটি সে পৃথিবীতে তার আবির্ভাবের পরে ক্রমবিকাশের ধারায় অর্জন করেছে।এই অন্যন্যসুলভ সম্পদটি শুধু মানুষেরই আছে, কারণ শুধু তারই প্রয়োজন আছে এই সম্পদের। তার কারণটি অবশ্য আমারা যদি তলিয়ে দেখি তবে ধরতে পারব এর মূলে আছে আবার অন্য একটি গভীরতর মানববৈশিষ্ট্য যেটি অন্য প্রাণীর নেই। সেটি হচ্ছে মানুষের মন এবং মনের ক্রিয়াজাত চিন্তারাজি। আর এই মন আছে বলেই মানুষ চিন্তাসম্পদের অধিকারী, সে ভাবসম্পদের জন্মদাতা। নিজের ভাব ও চিন্তার সম্পদকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে চায় বলেই তার প্রয়োজন হয় উন্নতর প্রকাশমাধ্যম। আর এই প্রকাশ মাধ্যম হচ্ছে 'ভাষা'।[56]

বস্তুত উন্নততর ভাব ও চিন্তাকে প্রকাশের জন্যেই মানুষের ভাষার প্রয়োজন। চিন্তার সঙ্গে, মানুষের মনের সঙ্গে, তার আত্মার সঙ্গে ভাষার এই অপরিহার্য সম্পর্ক আছে বলেই জার্মান মনীষী হুমবোল্ট বলেছেন-"মানুষের ভাষাই হল তার আত্মা, আর তার আত্মাই হল তার ভাষা। ভাষা হচ্ছে মানুষের চিন্তার ধ্বনিমাধ্যম প্রকাশ"।[57]

---

[56]সাধারন ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা –ডঃ রামেশ্বর শ , পৃষ্ঠা নাম্বার-১,(vols-1 and 2 in one).

[57]সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা- ডঃ রামেশ্বর শ, পৃষ্ঠা নাম্বার-২, (vols. 1 and 2 in one).

"মানুষের এই মূল স্বাতন্ত্র্য চিহ্ন যে মনন ও চিন্তন তার উপযুক্ত গুরুত্ব স্বীকার করে আমরা বলতে পারি যে, এক মনের চিন্তাকে আমরা যখন অন্য মনের কাছে পৌঁছে দিতে চাই তখন দরকার হয় একটি প্রকাশ মাধ্যমের। আর এই প্রকাশ মাধ্যম হল ভাষা। একজনের কথা যখন আমরা অন্য জনের কাছে পৌঁছে দিতে চাই তখন হয় ভাষার জন্ম। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে ভাষা সৃষ্টির জন্য অন্তত দুটি মানুষের প্রয়োজন। এবং এক্ষেত্রে আমরা যখন দুই বা তার বেশী মানুষের সঙ্গে ভাষার আদান-প্রদান করি অথবা দুই বা তার বেশী মানুষের সংস্পর্শে আসি তখনই সৃষ্টি হয় ভাষাসংস্কৃতি"।[58]মানুষের সমাজ সংস্কৃতি গুলির মধ্যে একটি হল ভাষাসংস্কৃতি।

ভাষা ও বাস্তবতাঃ

সামগ্রিক দিক থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যাচ্ছে যে, ভাষা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। কেননা আমাদের জীবন, মনন, সমাজ, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভাষার প্রভাব উল্লেখযোগ্য। জীবন, মনন, সমাজ, সংস্কৃতি প্রত্যেকটি ক্ষেত্র থেকে রস সংগ্রহ করে ভাষা হয়ে ওঠে জীবন্ত।সুতরাং দেখা যাচ্ছেযে সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক প্রয়োজন এই ভাষার প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। ভাষা প্রকৃতির নিয়ন্ত্রন যেমন সমাজের দ্বারা গঠিত হয়, তেমনি সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতির মানের উপর ভিত্তি করে নিয়ন্ত্রিত হয় ভাষার মান। এই সংস্কৃতি- শিল্প- সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে একটি সমাজ যখন ক্রমোন্নতি লাভ করে তখন সেই সমাজের মধ্যে এসে পড়ে ভাষা প্রকাশের সূক্ষাতিসূক্ষ ভাব। যার ফলে সেই সমাজের ক্ষেত্রে হয়তো ভাষার পরিবর্তন যেন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এই সব দিক দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে ভাষার সঙ্গে মানুষ, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য সবকিছুরই যোগাযোগ অপরিহার্য।

কিন্তু আমাদের এটাও লক্ষ্য করা দরকার "এই মহাবিশ্ব যখন সৃষ্টি হচ্ছে তখন কি আদ ধ্বনির অস্তিত্ব ছিল ? জীব-জগতের ধ্বনি শ্রবণের পারঙ্গমতার পূর্বেও কি ধ্বনির ব্যবহার ছিল ? "অনাহত" ধ্বনি এবং স্বর যন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট ধ্বনি কি একই উপাদানে গঠিত ?মানুষ কেন স্বর যন্ত্রের দ্বারা শ্বাস নিয়ন্ত্রন করে অর্থ ও ভাবের আদান – প্রদান করে, যেখানে মানুষ দৃষ্টির মাধ্যমে বা অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে এই ভাবের আদান- প্রদান সমান ভাবে সফল হয়ে উঠত।

[58]সধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা – ডঃ রামেশ্বর শ, পৃষ্ঠা নাম্বার – ৩, (vols.1 and 2 in one).

তবে কেন মানুষ তাদের ভাব প্রকাশের জন্য অন্যান্য মাধ্যম গুলিকে গ্রহণ করল না? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর গুলি কিছু সুনির্দিষ্ট ও সঠিকদার্শনিক প্রস্তাবনার স্তর অতিক্রম কওরে না। আবার এটাও প্রণিধান যোগ্য যে এই সব দার্শনিক প্রস্তাবনার সত্যতা একেবারে সামগ্রিক ও চিরকালীন নয়। মানুষের বুদ্ধির বিকাশের কোন এক স্তরে শ্বাস যন্ত্রের দ্বারা শ্বাস নিয়ন্ত্রন করে ভাব ও অর্থের প্রদান কে মুখ্য রূপ দেওয়া হয়েছিল। এর পরে সংখ্যা ও বর্ণের প্রচলন ঘটে এবং এরা শব্দের স্থান গ্রহন করে।তবে এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে লিপির ভাষা তবে কেন শব্দের ভাষাকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপন করতে পারল না।

কিন্তু প্রশ্ন হল ভাষা কি কোন "অর্থ" নাকি কোন জাগতিক "বস্তু"?। এটা কি কোন অতীন্দ্রিয় নাকি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ? এটা কি শুধু মাত্র ঊর্ধ্বতনের প্রক্রিয়ায় তৈরী হওয়া মানব দেহে ও মনের একটি বিশেষ জৈবিক ক্রিয়া, নাকি ভাষা এই সব কিছুরই একটি সুসংহত রূপ ? যদিও ভাষাতত্ত্ব মানব বিজ্ঞানের শাখা গুলির মধ্যে সবচেয়ে উন্নত অংশ"।[59]

ভাষা সংস্কৃতিঃ

সংস্কৃতি বিষয়ে একটি বহুল প্রচালিত ধারণা হল ভাষা। সুতরাং ভাষাই হল এই সংস্কৃতির একমাত্র মাধ্যম এবং ভাষা ও সংস্কৃতি হল এক ও অভিন্ন ধারণা। আবার এটাও বলা হয় যে ভাষা ছাড়া জ্ঞান বা চেতনার উন্মেষ অসম্ভব। ভাষার মাধ্যমে মানুষ একটি সমাজকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে নিয়ে যেতে পারে। কোনো সমাজের সংস্কৃতিকে জীবজগতের সন্মুখে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ভাষার অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। তাই ভাষা হল একটি সমাজের সংস্কৃতির অঙ্গ। এই ভাষা সংস্কৃতি কোনো সমাজের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে সম্ভব হতে পারে না। আর এই শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রকাশের মাধ্যম গুলির মধ্যে একটি হল ভাষা। ভাষা ও সংস্কৃতি হল একে অপরের পরিপূরক।[60]

সুন্দরবনে বিভিন্ন জনজাতির মানুষ বসবাস করে। এখানে বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে আদিবাসী জনজাতির মানুষজনও বসবাস করে, যেমন- ওরাওঁ, মুন্ডা, ভূমিজ

[59]ভারতীয় ভাষা লোক সর্বেক্ষণ, পশ্চিমবঙ্গের ভাষা, (খন্ড ৩১, ভাগ ৩)। গনেশ দেবী, শংকর প্রসাদ সিং এবং ইন্দ্রনীল আচার্য।
[60]সাধারন ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা- ডঃ রামেশ্বর শ, পৃষ্ঠা নাম্বার- ৬,(Vols. 1 and 2 in one)

প্রভৃতি জনজাতি। এই আদিবাসী জনজাতিগুলির মধ্যে ভূমিজ জনজাতির বাস সুন্দরবনের মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণনায় বেশী। আমাদের আলোচনার বিষয় হল "দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভূমিজ জনজাতির ভাষা সংস্কৃতি ও অলঙ্কার"হলেও এখন আলোচনার বিষয় হল ভাষা সংস্কৃতি।

সুন্দরবন তথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় বসবাসকারী ভূমিজ জনজাতির "ভাষা সংস্কৃতি" সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে দেখতে হবে এখানকার ভূমিজ জনজাতি কোন ভাষাতে কথা বলে। এদের নিজেদের নিজস্ব কোনো ভাষা আছে নাকি এরা স্থানীয় ভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

"ভূমিজ" জনজাতি হল ভারতের মূলত পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, নাগপুর, এবং সিংভূম জেলায় বসবাসকারী একটি জনজাতি। এখানকার ভূমিজ জনজাতি মূলত অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত মুন্ডারি ভাষাতে কথা বলে।[61] তবে ছোটনাগপুর, মালভূমির নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ভূমিজরা মুন্ডারি ভাষার সঙ্গে নিজেদের এখনো পরিচিতি রাখলেও পূর্বাঞ্চলের ভূমিজরা বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভূমিজ জনজাতি এই মুন্ডারি ভাষা থেকে সরে এসে "সাদরি" ভাষাকে ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে।দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভূমিজ জনজাতি 'সাদরি' ভাষা কে ভাষা হিসাবে গ্রহণ করলেও এরা পরে বাংলা ভাষার প্রভাবে আসে এবং বাংলা ভাষাতেও কথা বলে। যার কারনে এদের মধ্যে দ্বি-ভাষীর প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে এখানকার ভূমিজ জনজাতির ভাষার মধ্যে মিশ্র সংস্কৃতির ভাষা তৈরী হয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভূমিজ জনজাতির ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমাদের আলোচনার বিষয় হলতাদের কথিত 'সাদরি' ভাষার উৎপত্তি, ধ্বনি তাত্ত্বিক, রূপ তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, বাক্যের গঠন এবং এই 'সাদরি' ভাষার সঙ্গে অন্যান্য আদিবাসী জনজাতির ভাষার সঙ্গে, বাক্যের গঠন সম্পর্কে কোনো তফাৎ অথবা সাদৃশ্য আছে কিনা তা আলোচনা করা। এছাড়া দক্ষিণ চব্বিশ

[61]ভূমিজ- http://bn.m.wikipedia.org, date-19/4/19.পৃষ্ঠা-১

পরগণায় বসবাসকারী ভূমিজ জনজাতিগন তাদের প্রচারিত ভাষা ‘সাদরি’ ভাষার পাশা-পাশি বাংলা ভাষার প্রতি ও তাদের একটা আগ্রহও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলা ভাষার প্রতি তাদের কেন এই আগ্রহ ? বাংলা শব্দের সঙ্গে এই ‘সাদরি’ ভাষার শব্দের একটা তুলনা মূলক আলোচনা।

সাদরি ভাষার উৎপত্তিঃ

“সাদরি’ ভাষার ইতিহাস ও উদ্ভব সম্পর্কে নানা জনে নানা মতের প্রকাশ করেছেন।তবে নৃতাত্ত্বিক বিচারে ‘সাদরি’ ভাষাভাষী জনজাতি সমূহ প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড বা আদি দক্ষিণ নর বা কোল গোষ্ঠী সম্ভূত। কিন্তু এদের কে প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড বলা হলেও নৃতত্ত্ববিদদের মতে মিশ্র-দ্রাবিড়-অস্ট্রিক (মুন্ডা, ওরাওঁ, ভূমিজ, খেড়িয়া ইত্যাদি) গোষ্ঠীর শাখার মানুষও বিদ্যমান। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বিচারে ‘সাদরি’ ভাষার উৎপত্তি হয় অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, না হয় দ্রবিড় অথবা মাঝা-মাঝি কোনো নতুন ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত বলে অনেকে মনে করেছেন। কিন্তু নৃতাত্ত্বিকবিদরা এই ’সাদরি’ ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষণা করে যে সমস্ত তথ্যের কথা বলেছেন ভাষা তাত্ত্বিকেরা নৃতাত্ত্বিকদের এই গবেষণা লব্ধ বিচারকে মুল্য না দিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকেরা কেবল মাত্র বাক্য গঠনের কৌশলের উপর গুরুত্ব দিয়ে ‘সাদরি’ ভাষাকে ইন্দো-আর্য পরিবারের অন্যতম সদস্য ভাষা বলে মনে করেছেন”।

তবে ‘সাদরি’ ভাষার স্বরূপসন্ধ্যানে ও নাম করনে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করেছেন। অনেকে মনে করেছেন ‘আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প’ গ্রন্থে অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত জনজাতির কথিত ভাষাকে ‘আসুরি’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই’আসুরি’ শব্দ থেকেই ‘সাদরি’ কথাটির উদ্ভব বলে অনেকে মনে করেন।

নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের বিচারে অনেকে আবার এটাও প্রমাণিত করেছেন যে, ভারতের ‘নিষাদ’ প্রজাতি (ওরাওঁ, মুন্ডা, ভূমিজ প্রভৃতি) আদিবাসী জনজাতি সমূহ গোড়ার দিকে একই গোষ্ঠীভুক্ত, এক ভাষা-ভাষী ও একই জাতি ছিল। অর্থাৎ ভাষাতত্ত্ব অনুযায়ী ‘সাদরি’ কথাটি ‘নিষাদ’ শব্দ থেকে উদ্ভুত হতে পারে।

আবার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী মহাশয় মনে করেন ‘‘সাধারণী’ শব্দ থেকে ‘সাদরি’ কথার উদ্ভব হতে পারে। কেননা, তিনি বলেছেন যে সাধারণ-অশিক্ষিত মানুষের ভাষা হল ‘সাদরি’ বা ‘সাধারণী’ এবং এটি ভাষা বাচক’’।

কোনটি উপভাষা ও কোনটি পূর্ণঙ্গ ভাষা তা যেমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে, তেমনি ‘সাদরি’ ভাষা পূর্ণাঙ্গ ভাষা কিনা তা মূলত নির্ভর করে ভাষাতাত্ত্বিকদের বিচারে নিম্ন লিখিত বৈশিষ্ট্য গুলির উপর ভিত্তি করে। এই বৈশিষ্ট্য গুলি হল- (ক) ভাষার নিজস্ব শব্দ ভান্ডার, (খ) সর্বনাম, (গ) ভাষার নিজস্ব ক্রিয়ারূপ,(ঘ) নিজস্ব শব্দরূপ, (ঙ) উচ্চারণ রীতি, (চ) কর্তা-কর্ম- ক্রিয়াগত ব্যাকরণ ভিত্তিক রচনা শৈলী, (ছ) বাচক গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক অবস্থান জনিত আচরণ ও সংস্কার ভিত্তিক বাচনিক অভিব্যক্তি। ‘সাদরি’ ভাষার মধ্যে উপরিউক্ত উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য গুলি লক্ষ্য করা যায়’’।[62]

আমরা যদি এই ‘সাদরি’ ভাষার রচনাশৈলীর দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখা যাবে এই ভাষার ব্যাকরণগত ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্য গঠন প্রনালী, ক্রিয়ারূপ, সর্বনাম, প্রভৃতি এবং অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত এই ‘সাদরি’ ভাষার শব্দ ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। আমরা যদি এই ভাষা-ভাষীর মানুষজনের বসতির স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করি তাহলে দেখব বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, কোচবিহার, বাঁকুড়া, বীরভূম, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জায়গায় বসবাসকারী ওরাওঁ, মুন্ডা, খেড়িয়া, ভূমিজ, হো প্রভৃতি আদিবাসী জনজাতিগন এই ‘সাদরি’ ভাষাতে কথা বলে।[63]

একটি ভাষার সামগ্রিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে সেই ভাষারবৈশিষ্ট্যগুলির গুরুত্ব হয়ে ওঠে অনিবার্য। সুতরাং আমরা বলতে পারি একটি ভাষার সামগ্রিক পরিচয়কে পাঠকের সন্মুখে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রয়োজন আবশ্যক তার মধ্যে একটি হল ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভূমিজ জনজাতির

[62]ভারতীয় ভাষা লোক সর্বেক্ষণ-পশ্চিমবঙ্গের ভাষা, খন্ড-৩১, ভাগ- ৩, পৃষ্ঠা নাম্বার-৪৯৩।
[63]ভারতীয় ভাষা লোক সর্বেক্ষণ-পশ্চিমবঙ্গের ভাষা, খন্ড-৩১, ভাগ- ৩, পৃষ্ঠা নাম্বার-৪৯৩।

ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করার ক্ষেত্রে তাদের এই প্রচারিত ‘সাদরি’ ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যঃ

একটি ভাষার উচ্চারিত ধ্বনি হল সেই ভাষার এমন একটি ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যা ভাষাটির ভাষাতাত্ত্বিক দিককে সমৃদ্ধ করে তোলে। এই ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমরা যদি ‘সাদরি’ ভাষার উচ্চারিত ধ্বনির দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, তাদের ভাষাতে উচ্চারিত স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি, যৌগিক স্বর, অর্ধস্বর গুলি হল যথাক্রমে -

১। উচ্চারিত ধ্বনি

(ক) স্বরধ্বনিঃ

অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও।

(খ) ব্যঞ্জনধবনিঃ

ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, স, হ, ড়, ঢ়।

(গ) যৌগিক স্বরঃ

অই, অউ, ওউ, আই, ইউ, উই প্রভৃতি।

(ঘ) অর্ধস্বরঃ

য়, ব, (ওয়)

সুতরাং আমরা উপরিউক্ত ভাষাতত্ত্বের আলোচনার ভিত্তিতে দেখতে পাচ্ছি যে ‘সাদরি’ ভাষায় ব্যবহৃত ভাষাতত্ত্বের উচ্চারিত ধ্বনি যেমন স্বর ধ্বনি, ব্যঞ্জন ধ্বনি, যৌগিক স্বর গুলির সঙ্গে বাংলা ভাষায় উচ্চারিত ধ্বনি গুলির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আবার আমরা যদি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য গুলি দেখি তাহলে দেখতে পাব সর্বনাম রূপ, ক্রিয়া রূপ, নঞর্থক ক্রিয়া রূপ এই তিন ধরনের বৈশিষ্ট্য।তা নিম্নে যথাক্রমে আলোচনা করা হল।[64]

২। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(ক) সর্বনাম রূপঃ

	একবচন	**বহুবচন**
উত্তম পুরুষ	হাম (আমি)	হানি/ হামনি(আমরা)
মধ্যম পুরুষ	তুঁ (তুমি)	তঁহনি (তোমাদের/তোমরা)
প্রথম পুরুষ	উ (সে)	ওখনি(তারা)

এবার আমরা দেখব নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কোনো ব্যক্তি এবং স্থানকে বোঝাতে যে কথাগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি হল-

নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কোনো ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্যে ‘ই’(এ), ‘এখনি’(এরা), ‘উ’(ও), ‘ওখনি’(ওরা) এবং স্থানের ক্ষেত্রে ‘হিঁয়া’(এখানে), ‘হুঁয়া’(ওখানে) কথাগুলি ব্যবহার করা হয়।

ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়ারূপ গুলি হল-

(খ) ক্রিয়ারূপঃ

আমরা ‘সাদরি’ ভাষায় ব্যবহৃত কয়েকটি বাক্যের বিশ্লেষণের দ্বারা ক্রিয়ারূপ গুলিকে ধরার চেষ্টা করবো। যেমন ধর “আমি যাচ্ছি”-“হাম জাইলেগিও” আমরা যদি এই বাক্যটির দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এটি অসমাপিকা ক্রিয়ার

[64] ভারতীয় ভাষা লোক সর্বক্ষেণঃ পশ্চিমবঙ্গের ভাষা, খন্ড৩১, ভাগ ৩, ২০১৭, গনেশ দেবী, শংকর প্রসাদ সিংহ ও ইন্দ্রনীল আচার্য।

উদাহরণ এবং যদি কালের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাচ্ছে বাক্যটির মধ্য দিয়ে ঘটমান বর্তমানকে প্রকাশ করছে। কেননা বাক্যটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ক্রিয়ার কাজ আরম্ভ হয়ে এখন চলছে।

আবার যদি "সে যায়"-"উ জায়লা" এই বাক্যটির ক্ষেত্রে দেখি তাহলে এটি একটি সাধারণ বর্তমান কালকে নির্দেশ করছে। আমরা জানি যে ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে নিষ্পন্ন হয়, তার কালরূপকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। অতএব বাক্যটি একটি সাধারণ বর্তমান কালের উদাহরণ এবং এটি একটি অসমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ। কেননা কাজটা এখনো সম্পন্ন হয় নি।

"আমি যাব না"-"হাম নেই জাবেই" এই বাক্যটি একটি নঞর্থক ক্রিয়ারূপ। আমরা জানি কোনো ক্রিয়াকে নঞর্থক করতে হলে ক্রিয়ার পূর্বে নঞর্থক অব্যয়কে বসানো আবশ্যক। অতএব বাক্যটিকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এটি নঞর্থক রূপের উদাহরণ। কেননা এই বাক্যটিতে ক্রিয়া 'জাবেই' কথাটির আগে নঞর্থক অব্যয় 'নেই' কথাটি বসে বসেছে।

"সে গেল"-"উ গেলেই" এই বাক্যটি একটি সাধারন অতীত কালের উদাহরণ। যদি কোনো ক্রিয়ার কাজটা অনির্দিষ্ট অতীতে সম্পন্ন হয় তবে সেটি হল সাধারণ অতীত। কেননা আমরা উপরের বাক্যটিতে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে ক্রিয়ার কাজটা অনির্দিষ্ট অতীতে সম্পন্ন হয়েগেছে।

"আমি গিয়েছিলাম- হাম গেলেহেলিও" এটিও একটি অতীত কালের উদাহরণ। কেননা ক্রিয়ার কাজটা পূর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তার ফলটাও শেষ হয়ে গিয়েছে।

এবারআমরা ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কালের আলোচনা কিছু বাক্যের দ্বারা করার চেষ্টা করবো। যেমন-

"আমি যাব - হাম জেবেই", "তুমি যাবে - তুঁ জেবি", "সে যাবে – উ জাতেই"।[65]এই বাক্যগুলির মধ্যেদিয়ে ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কালকে নির্দেশ করা হচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে ক্রিয়ার কাজটা এখনো ঘটেনি বা ঘটছে না কিন্তু পরে বা ভবিষ্যতে ঘটবে এমন অর্থ প্রকাশ করছে।

সুতরাং আমরা উপরিউক্ত কিছু বাক্যগুলির আলোচনার দ্বারা 'সাদরি' ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়ার কয়েকটি রূপগুলিকে নিরুপন করার চেষ্টা করলাম। ভূমিজ জনজাতির ভাষা সংস্কৃতি আলোচনা করার ক্ষেত্রে এগুলিকে নিরুপন করা প্রয়োজন।

এবার আলোচনা করবো বাক্যের গঠন সম্পর্কে। ভাষা সংস্কৃতি আলোচনা করার জন্যে বাক্যের দিকেও আলোকপাত করার প্রয়োজন আছে।

(৩) বাক্য গঠনঃ

এ ভাষায় বাক্যের পদবিন্যাস রীতি কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া অনুসারে বসে। যেমন-

সদর্থক বাক্যঃ

"আমি বই পড়ি – হাম বই পড়লেগিও"।এই বাক্যটি কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া অনুসারে বসেছে। বাক্যটিতে কর্তা হল 'হাম' শব্দটি, কর্ম হল 'বই' এবং ক্রিয়া হল 'পড়লেগিও'।

"আমি গিয়ে বলবো – হাম জাকে বলবেই"। এটিও একটি সদর্থক বাক্য এখানে কর্তা হিসবে 'হাম' শব্দটি বসেছে। 'জাকে' শব্দটি মূলত অসমাপিকা ক্রিয়া হিসেবে বসেছে। কেননা 'হাম জাকে' এই বাক্যটি একটি অসম্পূর্ণ বাক্য। তাই 'জাকে' শব্দটি হল অসমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ এবং 'বলবেই' হল সমাপিকাক্রিয়া হিসাবে বসেছে।

[65]পারবতী সরদারের কাছে থেকে তথ্যটি সংগৃহীত হয়েছে। স্থান- কুলতালি।

নঞর্থক বাক্যঃ

"আমি না গিয়ে বলবো না – হাম নেই জাকে নেই বলবেই"। এখানে কর্তা 'হাম', 'নেই' হল নঞর্থক বাচক, 'জাকে' অসমাপিকা ক্রিয়া এবং 'বলবেই' এখানে সমাপিকা ক্রিয়া হিসবে বসেছে।

প্রশ্নবোধক বাক্যঃ

"সে কোথায় যায় – উ কাঁহা জায়লা"। এখানে 'উ' কর্তা এবং ক্রিয়া হিসাবে 'জায়লা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[66]

সুতরাং আমরা দেখলাম দক্ষিন চব্বিশ পরগণার ভূমিজ জনজাতির কথিত 'সাদরি' ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যের গঠন প্রণালী, ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়ারূপ, উচ্চারণ রীতির ব্যবহার কেমন ভাবে করা হয়। শব্দ গুলির ব্যবহার কোথায় কেমন ভাবে করা হচ্ছে তা আমরা আলোচনার মধ্যদিয়ে ধরার চেষ্টা করলাম।আমাদের আলোচ্য বিষয় ভাষাসংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করার ক্ষেত্রে এগুলির আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা এগুলিকে বাদ দিয়ে একটি ভাষার 'ভাষাসংস্কৃতি' আলোচনা করা যায় না। একটি সমাজের ভাষা সংস্কৃতিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সেই ভাষার ব্যবহৃত শব্দ, উচ্চারিত ধ্বনি, বাক্যের গঠন, ক্রিয়ারূপ এই সমস্ত কিছুর গুরুত্ব অপরিসীম।

সাদরি ভাষার সঙ্গে সাঁওতালি ও মুন্ডারি ভাষার তুলনাঃ

আমাদের 'ভাষা সংস্কৃতি' আলোচনা করার ক্ষেত্রে আর একটি দিক আলোচনা করা জরুরি যেটি হল ভূমিজ জনজাতির ব্যবহৃত এই 'সাদরি' ভাষার সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি আদিবাসী যেমন 'সাঁওতাল' ও 'মুন্ডা' জনজাতিগনের ব্যবহৃত 'সাওতালি' ও 'মুন্ডারি' ভাষার শব্দভান্ডারের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য অথবা মিল আছে কিনা তা দেখা। সুতরাং আমরা এই তিনটি ভাষার মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করি তাহলে বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে।

[66]পশ্চিমবঙ্গের ভাষা- গনেশ দেবী, ইন্দ্রনীল আচার্য, শংকর প্রসাদ সিংহ(ওরিন্ট ব্ল্যাকসোয়ান)। voll-31, part-3.

আমরা যদি 'মুন্ডারি', 'সাঁওতালি' ও 'সাদরি' এই তিনটি ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করি তাহলে দেখব এই ভাষা তিনটি অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত।[67] তবে ভাষা তিনটি একই ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত হলেও এই ভাষাগুলির উচ্চারিত বাচনিক শব্দ বা ধ্বনি ভিন্নভিন্ন। তবে 'মুন্ডারি' ও 'সাঁওতালি' ভাষা দুটির মধ্যে কিছু কিছু শব্দের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও তা খুব কম। তবে এই তিনটি ভাষার বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার অবস্থান প্রায় একই তা উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করলে বিষয়টি সহজে বোধগম্য হবে।

সুতরাং আমরা যদি আলোচনা করি তাহলে দেখা যাচ্ছে 'সাদরি' ভাষায় একবচনে ব্যবহৃত শব্দ 'হাম' কথাটি 'আমি' অর্থে ব্যবহৃত করা হচ্ছে। তেমনি 'সাঁওতালি' ও 'মুন্ডারি' ভাষাতে 'আমি' শব্দটিকে বোঝাতে 'আঞি/ঈঞ' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

আবার বহুবচনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি তাহলে 'সাদরি' ভাষায় উচ্চারিত 'হানি', 'হামনি', 'তহনি' শব্দগুলি 'আমরা' ও 'তোমরা' অর্থে ব্যবহার করা হয়। তবে এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল যেখানে আমরা একবচনে 'মুন্ডারি' ও 'সাঁওতালি' ভাষায় উচ্চারিত শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সেখানে বহুবচনে কিছু ক্ষেত্রে একই থাকছে আবার কিছু ক্ষেত্রে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। যেমন 'মুন্ডারি' ভাষার ক্ষেত্রে 'আমরা' কথাটিকে বোঝাতে 'আলে' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তেমন 'সাঁওতালি' ভাষাতেও 'আমরা' কথাটির অর্থে 'আলে' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে।তবে 'তোমরা' কথাটিকে বোঝানোর ক্ষেত্রে দুটি ভাষাতে উচ্চারিত শব্দ ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। যেমন 'সাঁওতালি' ভাষাতে 'তোমরা' কথাটির অর্থে 'আপে' এবং 'মুন্ডারি' ভাষাতে 'আবেন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

আবার কোনোস্থান ও ব্যক্তির'নিকট' অথবা 'দূর' বোঝানোর জন্যে যে শব্দগুলির ব্যবহার করা হয় সেগুলি একটু আলোচনা করা যাক।

---

[67]PLSI, VOLUME-31,PART-3.

"সাদরি' ভাষায় একবচনে ও বহুবচনে নিকটবর্তী কোনো ব্যক্তিকে বোঝাতে 'এ' অর্থে 'ই' এবং 'এরা' অর্থে 'এখনি' কথাগুলি ব্যবহার করা হয়। আবার দূরবর্তী কোনো ব্যক্তিকে বোঝাতে 'ও' অর্থে 'উ' এবং 'ওরা' অর্থে 'ওখনি' কথাগুলি ব্যবহৃত হয়। আবার স্থানের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কোনো কিছুকে নির্দেশ করতে 'এখান' অর্থে'হিঁয়া' এবং 'ওখান' অর্থে 'হুঁয়া' ব্যবহার করা হয়।

'সাঁওতালি' ভাষায় ব্যক্তি ও স্থানের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কোনো কিছুকে বোঝাতে যে শব্দগুলির ব্যবহার করা হয় সে গুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে নিকটবর্তী ব্যক্তিকে বোঝাতে 'এ' অর্থে 'নুঈ' এবং 'এরা' অর্থে 'নুকু' কথাগুলি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া দূরবর্তী ব্যক্তিকে বোঝাতে 'উনি' শব্দটি ব্যবহার করা হয় 'ও' এবং 'ওরা' অর্থে 'উনকু' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

দূরবর্তী স্থানের ক্ষেত্রে 'ওখান বা ওখানে' অর্থে 'অঁডে' এবং নিকটবর্তী স্থানের ক্ষেত্রে 'এখানে' অর্থে 'নডে বা নড়ে' কথাগুলি ব্যবহার করা হয়।

'মুন্ডারি' ভাষার ক্ষেত্রে নিকটবর্তী ব্যক্তিকে নির্দেশ করার জন্য 'এ' অর্থে 'নিঃ' এবং দূরবর্তী ব্যক্তিকে নির্দেশ করার ক্ষেত্রে 'ও' অর্থে 'আঃ কো' শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া নিকটবর্তী স্থান বোঝাতে 'এখানে' অর্থে 'নেডে' এবং দূরবর্তী স্থানকে নির্দেশ করতে 'ওখানে' অর্থে 'হান্ডে' কথাগুলি ব্যবহার করা হয়"।[68]

অতএব আমরা উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলতে পারি 'সাদরি' ভাষার বাচন শব্দ মুন্ডারি ও সাওতালি ভাষা থেকে আলাদা। প্রত্যেক ভাষার একটা নিজস্বতা আছে তেমনি এই ভাষার নিজস্বতা রয়েছে।

এবার আমরা যদি ভাষা তিনটির মধ্যে সাদৃশ্যের কথা বলি তবে সে ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় বাক্যের গঠন বিন্যাসে। ভাষা তিনটির বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে কর্তা-কর্ম- ক্রিয়া একই অবস্থানে বসছে তা আমরা উদাহরণের সাহায্যে দেখার চেষ্টা করবো।

[68]ভারতীয় ভাষা লোক সর্বেক্ষণঃ পশ্চিমবঙ্গের ভাষা, খন্ড-৩১, ভাগ-৩, (ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান)।

উদাহরণঃ

'সাদরি'- হাম বই পড়লেগিও।

(কর্তা) (কর্ম) (ক্রিয়া)

'মুন্ডারি'- আঁই পুথি পড়হাওতানাই।

(কর্তা) (কর্ম) (ক্রিয়া)

'সাঁওতালি'- ঈঞ পতব পাড়হাঃআ।

(কর্তা) (কর্ম) (ক্রিয়া)

সুতরাং আমরা দেখলাম 'সাদরি' ভাষায় উচ্চারিত শব্দের সঙ্গে আলোচিত আদিবাসী জনজাতির ভাষায় উচ্চারিত শব্দের পার্থক্য থাকলেও বাক্যের গঠন শৈলীর দিক থেকে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার অবস্থান অভিন্ন।

ভাষা সংকটঃ

একটি ভাষার পরিবর্তন হয় মূলত সময়ের পরিপ্রেক্ষীতে। সময়ের সাথে সাথে মানুষ যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ভাষার পরিবর্তন হয়ে পড়ে অনিবার্য।

দক্ষিন চব্বিশ পরগণাতে বসবাসকারী ভূমিজ জনজাতির ভাষা সংস্কৃতির দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখব যে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যে দু-ধরনের ভাষা অর্থাৎ বাংলা ও সাদরি ভাষাতে কথা বলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যার কারনে তাদের ভাষা হয়ে উঠেছে "দ্বিভাষী"[69]।ফলে তাদের ভাষার মধ্যে এক ধরনের মিশ্রভাষা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

[69]ভারতের আদিবাসী-সুবোধ ঘোষ। পৃষ্ঠা-১২৪।

ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রীয়ার সন তাঁর " 'linguistic survey of India'গ্রন্থে 'মুন্ডারি' ভাষা হিসাবে ভূমিজ জনজাতির ভাষাকেও চিহ্নিত করেছেন"[70]। রিজলি সাহেব তাঁর " 'Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে ভূমিজ জনজাতিকে মুন্ডাদের একটি শাখা হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি আরো বলেছেন তারা মুন্ডারি ভাষা হারিয়ে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেছে"।[71] দক্ষিনবঙ্গের ভূমিজ জনজাতির অনেকেই এই 'মুন্ডারি' ভাষাতে কথা বলে না। তারা ভাষা হিসাবে 'সাদরি' ভাষাকে গ্রহণ করেছে এবং সময়ের সাথে সাথে বাংলা ভাষাকেও গ্রহণ করেছে। একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কথা বলার ভাষাতে কথা বলার আগ্রহ বেশিই। তবে এর কারন হিসাবে অনেকেই মনে করছেন যে হিন্দু বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে পাশাপাশি বসবাসের কারনে এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে তাদের মধ্যে বাংলা ভাষা একটা স্থান দখল করে নিয়েছে ধীরে ধীরে।

সময়ের দিক থেকে দেখতে গেলে স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে এই পরিবর্তনের আঁচ পড়তে শুরু করেছিল।সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মূল হিন্দু বাঙালী সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারনে এই ভূমিজ জনজাতির ভাষা সংস্কৃতির মধ্যে বাংলা ভাষাতে কথা বলার প্রাধান্য অনেক বেড়ে চলেছে। আমরা কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে তা দেখার চেষ্টা করব।

'সাদরি' ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয় তা কয়েকটি শব্দের সাহায্যে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

---

[70] peoples Linguistic survey of india, plsi volume 31, part 3, pg-386.

[71] Tribes and castes of Bengal-H. H. RISLEY, vol-1, 1891, pg-xliv .

সাদরি ভাষা	বাংলা ভাষা
হানি/হামনি	আমরা
জায়লা	যাচ্ছে
জেবাই	যাব
সিঁজানো	সিদ্ধকরা
হেকি	হলাম
হাম	আমি
কাঁহা	কোথায়
জেবি	যাবি

এই বাংলা শব্দগুলি ব্যবহারের কারনে দক্ষিনবঙ্গের ভূমিজ জনজাতি তাদের ভাষার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলছে। যার ফলে ভাষা সংকটের একটা পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। একটি ভাষাভাষীর জনজাতি যখন তাগিদে নিজেদের ভাষাকে বর্জন করতে শুরু করে তখন সেই ভাষা লুপ্ত হতে থাকে ধীরে ধীরে।

ভাষা সংস্কৃতির সংকটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল এই দ্রুত ভুবনায়নের যুগে গড়ে ওঠা উন্নয়নের তত্ত্ব।[72] আবার আমরা দেখি যে খেলা-ধূলা, রাজনৈতিক, শিক্ষিত হওয়া প্রভৃতি কারনে এই সমাজের মধ্যে এক ধরনের ভদ্র শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে যাদের মধ্যে নিজেদের ভাষা বর্জনের প্রবনতা বেশী লক্ষ্য করা যায়। একটি সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষজন হল সেই সমাজের উন্নতির কান্ডারি। তবে দক্ষিন চব্বিশ পরগণার ভূমিজ জনজাতি সমাজের মানুষজননিজেদের সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে চেষ্টা করছে বাংলা ভাষার মাধ্যমে।তবে

[72]ভারতীয় ভাষা লোক সর্বেক্ষণ- পশ্চিমবঙ্গের ভাষা,(ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান), খন্ড ৩১, ভাগ-৩, ২০১৭, লেখক- গনেশ দেবী, শংকর প্রসাদ সিংহ, ইন্দ্রনীল আচার্য। pg-xxxii.

এখনো সাধারণ নিরক্ষর মানুষজন যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে তখন এই ‘সাদরি’ ভাষাতে কথা বলে।

সুতরাং আমরা আলোচনা করলাম দক্ষিনবঙ্গের ভূমিজ জনজাতি সাধারণের কথিত ‘সাদরি’ ভাষার ‘ভাষা সংস্কৃতি’ সম্পর্কিত কিছু তথ্য। আলোচনার মাধ্যমে দেখলাম এই ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, সাদরি ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার তুলনামূলক আলচনা এবং এই ভাষাকে হারিয়ে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ কিভাবে একটি ভাষা সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে তার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা ।

অলংকার

সংগীত দ্বারা গীত, বাদ্য, নৃত্য এই তিনটি বিষয়ের সমাবেশকে উল্লেখ করা হয়। গীত একধরনের শ্রবণ যোগ্য কলা যা সুসংবদ্ধ শব্দ ও নৈশব্দের সমন্বয়ে মানব চিত্তে বিনোদন সৃষ্টি করতে সক্ষম। স্বর, সুর ও ধ্বনির সমন্বয়ে গানের সৃষ্টি হয়। এই ধ্বনি হতে পারে মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনি অথবা যন্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন শব্দ। আবার বলা যেতে পারে উভয়ের সংমিশ্রনে গান। গানের ক্ষেত্রে সুর যেমন প্রধান বাহক হিসাবে কাজ করে, তেমন আবার গানের কথার ক্ষেত্রে অলংকার ও হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ।

সুরের সঙ্গে অলংকারও গানের কথার সৌন্দর্য্যকে বাড়িয়ে তোলে। দেহের সৌন্দর্য্য থাকলে সেটাকে স্বীকার করতে বাধা থাকে না। অলংকার যেমন দেহের শোভা বাড়িয়ে সৌন্দর্য্যের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে, তেমনি গানের ক্ষেত্রেও অলংকার গানের কথার মধ্যে চমৎকারত্ব সৃষ্টি করে গানের সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে।[73]

রবীন্দ্রনাথ কাব্যের অলংকারকে ‘ছবি’ বলেছেন- “কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না, ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। উপমা – রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ”।[74]

রবীন্দ্রনাথ অলংকার সম্পর্কে আরো বলেছেন-“ যা অত্যন্ত অনুভব করি, সেটা যে অবহেলার জিনিস নয়, এই কথাকে প্রকাশ করতে হয় কারুকাজে।এই ‘কারুকাজ’-ই হল কাব্যের অলংকার”।[75]

আমরা কয়েকটি গানের আলোচনার মধ্যদিয়ে অলংকার সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবো। যেমন-

---

[73]সঙ্গীত-উইকিপিডিয়া, http://bn.m.wikipedia.org>wiki. Date-26/04/19.পৃষ্ঠা-১।

[74]অলঙ্কার-চন্দ্রিকা-শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী। পৃষ্ঠা-৩, ২০১৩।

[75]বাংলা অলংকার রূপ ও স্বরূপ- ডঃ মিহির চৌধুরীকামিল্যা, পৃষ্ঠা-১২।

"টুসু ঠাকুর মাগো, আলতা পরা গা গো।

সোনার খাটে হেলান দিচ্ছে, রূপার খাটে পা গো"।

এই গানটি হল অন্ত্যানুপ্রাস অলংকারের একটি উদাহরণ। কেননা অন্ত্যানুপ্রাস অলংকারের যা বৈশিষ্ট্য তা এই গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে। "অন্ত্যানুপ্রাসের বৈশিষ্ট্য হল পঙক্তি গুলির শেষে অক্ষরের মিল"।[76] তাই উপরিউক্ত গানের দুটি পঙক্তির শেষে "গো" অক্ষরে মিল পাচ্ছি।

"তেল দিলাম, সলতে দিলাম, এল ভগবতী।

গাই এল, বাছুর এল, এল দূর্গাসতী।

একে একে লে মা সন্ধ্যা লক্ষ্মী-সরস্বতী"।

এই গানটিও একটি অন্ত্যানুপ্রাস অলংকারের উদাহরণ। কারন গানটির পঙক্তিগুলির শেষে ধ্বনি সাম্য ঘটেছে।

প্রথম চরণের শেষ শব্দ 'ভগবতী'-এর 'তী'।

দ্বিতীয় চরণের শেষ শব্দ 'দূর্গাসতী'-এর 'তী'।

তৃতীয় চরণের শেষ শব্দ 'সরস্বতী'-এর 'তী'।

অর্থাৎ 'তী' অক্ষরের মধ্যে ধ্বনি সাম্য ঘটেছে। এই গানটির ক্ষেত্রেও অন্ত্যানুপ্রাসের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে।

[76]বাংলা অলংকার রূপ ও স্বরূপ- ডঃ মিহির চৌধুরীকামিল্যা, পৃষ্ঠা- ১৭।

"তাল গাছে শুঁয়ো পোকা।

এটা নাকি বাবুর কাকা।

বলনা বাবু তোর কাকা কে।

কি দোষে ছাড়িল আমাকে"।

এই গানটার দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাচ্ছে গানটি হল অন্ত্যানুপ্রাস অলংকারের সাথে সাথে রূপক ও শ্লেষ অলংকারের একটি উদাহরণ। এই গানে রূপক অলংকারটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে "শুঁয়ো পোকা" ও "বাবুর কাকা" এই শব্দগুলির মধ্যে। এখানে 'শুঁয়ো পোকা' হল উপমান এবং 'বাবুর কাকা' হল উপমেয়। কেননা বাবুর কাকাকে শুঁয়ো পোকার সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং উপমেয় ও উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। তেমনি এটি আবার একটি শ্লেষ অলংকার এখানে 'বাবুর কাকাকে' শ্লেষের ভঙ্গিতে 'শুঁয়ো পোকা' বলা হয়েছে। এছাড়া এই গানটি অন্ত্যানুপ্রাস অলংকারের উদাহরণ। কারন গানের পংক্তি গুলির শেষে 'কা-কা' ও 'কে-কে' অক্ষর গুলির মধ্যে ধ্বনি সাম্য ঘটেছে।

সুতরাং আমরা কয়েকটি গানের আলোচনার মধ্যমে দেখতে পেলাম ভূমিজ জনজাতির মানুষের গাওয়া গান গুলির মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস, রূপক ও শ্লেষ অলংকারের প্রাধান্য বেশি।

উপসংহার

“গানের আলোকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভূমিজ জনজাতির লোকসংস্কৃতি চর্চা”বিষয়টি সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে আমার আলোচ্য গবেষণা পত্রে ‘ভূমিজ জনজাতির লোকসংস্কৃতি চর্চায় গান’, ‘সুন্দরবনের ভূমিজ জনজাতির ইতিহাস ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান’ এবং ‘ভাষা সংস্কৃতি ও অলংকার’ সম্পর্কিত বিষয়গুলিও উপস্থাপনার চেষ্টা করেছি। গানের মধ্য দিয়ে ভূমিজ জনজাতির প্রতিফলিত সমাজ ভাবনার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। হিন্দু বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে পাশা-পাশি বসবাস করা সত্ত্বেও ভূমিজরা নিজেদের সংস্কৃতির রীতিনীতি আজও সমান ভাবে পালন করছে।

সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের চাওয়টা খুবই ছোট। কবির ভাষায় ‘ছোট ছোট মানুষের ছোট ছোট আশা’। এই ছোট ছোট চাওয়ার মধ্যদিয়ে এরা তুলতে চায় এদের সংস্কৃতি। জীবন ধর্ম অর্থনৈতি সামাজিক পরিবর্তন। দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার সংস্থান আর মোটা কাপড়ের পোশাক পরিচ্ছদ। কবির ভাষায় মায়ের কাছে এদের আকুতি ‘চাই না মা আমি রাজা হতে, বাঁশের খুঁটির খড়ের চালে পারি যেন মা খড় যোগাতে’। কিন্তু এক শ্রেণির লোভী মানুষের শিকার হয়ে এই সাধারণ মানুষ দীর্ঘকাল অনাহারে, অর্ধাহারে থেকেছে বেশির ভাগ সময়। দারিদ্রতা থাকে এদের নিত্য সঙ্গী। এই সমস্ত সাধারণ দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষার চিত্র তুলে ধরা চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিজ জনসমাজের প্রতিফলিত সমাজ ভাবনা তুলে ধরার সাথে সাথে সুন্দরবনে বসবাস করার ইতিহাস ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার সময় থেকে তাদের ইতিহাস ও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটেছে এবং এই পরিবর্তনের ফলে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজি্ক, রাজনৈতিক অবস্থার যে উন্নতি হয়েছে, তার একটা পরিচয় সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমানে তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থার উন্নতির কারনে তাদের ভাষাসংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচিত হওয়ার সাথে সাথে এই ভাষাসংস্কৃতিরও পরিবর্তন হচ্ছে।

আজ ভূমিজ জনসমাজের সাধারণ মানুষের ঘরের ছেলেমেয়ে এমনকি দিনমজুর ঘরের অনেক ছেলেমেয়েও কোলকাতা শহরে এসে লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হচ্ছে এবং শহরের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি হচ্ছে, যার কারনে কথা বলার ক্ষেত্রে নিজেদের কথিত ভাষা থেকে ধীরে ধীরে সরে আসছে এবং স্থানীয় বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। মানুষের চাহিদার কাছে প্রয়োজনহীন বিষয়গুলি হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের আলোচ্য গবেষণা পত্রে উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমে দক্ষিন চব্বিশ পরগণার ভূমিজ জনজাতির সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এই সমস্ত কিছু নিয়ে গড়ে ওঠে একটি সমাজের সংস্কৃতি।

পরিশিষ্ট

ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত গানগুলি পরিশিষ্টে তুলে দেওয়া হল-

টুসুগানঃ

১. "তেল দিলাম, সলতে দিলাম, এল ভগবতী".....।

(নাম-লতিকা সরদার,স্থান-কুলতলি, তারিখ-২২.১১.২০১৮, গান নং- ৪)

২. "ধান শিষটাল তোলা".....।

(নাম-মেনকা সরদার, স্থান- কুলতালি, তারিখ-২২.১১.২০১৮, গান নং- ৭)

ক্ষেত্র সমীক্ষায় টুসু পূজার উপকরণ ও পদ্ধতি সম্পর্কিত কথোপকথনঃ

(গৌর সরদার(পুরুষ), বয়স-৬৫+, স্থান- কুলতলি, তারিখ- ৪.২.১৯)

১।প্রশ্ন- টুসু পূজায় কি কি উপকরণ ব্যবহার করা হয়?

উত্তর- তুষ বা ধান, মূলাফল, তুরুল, গাঁদা ফুল, গোবর নাড়ু, দূর্বা, বেগুন-পাতা, মিষ্টি, পার্বনের পিঠে।

২। প্রশ্ন-টুসু পূজা কোন সময় করা হয়?

উত্তর- পৌষ সংক্রান্তির সময়।

৩।প্রশ্ন-টুসু পূজার পদ্ধতি কেমন?

উত্তর- পিঠের হাঁড়িতে ফুল, দূর্বা, মিষ্টি, পিঠে রাখা হয় এবং প্রতিমার পাশে একটি গর্ত করা হয়। গর্তের মধ্যে ফুল, ধান, দূর্বা ঘাস রেখে একটি তুরুল কেটে তিন প্রহরে তিনবার বলি দেওয়া হয়।

করম গানঃ

১. "শালুক খেয়ে দাঁত ও কালো".....।

(নাম- ভারতী সরদার, স্থান- চাতরাখালী, তারিখ- ১০.২.১৯, গান নং- ১০)

২. "দাও দাও কৃষ্ণ চোরা বসনও আমারে".....।

(নাম- গৌর সরদার, স্থান- কুলতলি, তারিখ- ৪.২.১৯, গান নং- ১৩)

৩. "হামাদের করম যাছে শহরে, আবার এসো গো".....।

(নাম- ভারতী সরদার, স্থান- চাতরাখালি তারিখ- ১০.২.১৯, গান নং- ১৫)

করম পূজা সম্পর্কিত কথোপকথনঃ

(মঙ্গল সরদার(পুরুষ), বয়স- ৩৫, স্থান- উত্তরমোকাম বেড়িয়া, তারিখ- ৪.২.১৯)

১। প্রশ্ন- করম পূজা কখন হয়?

উত্তর- করম পূজা হয় ভাদ্র মাসে একাদশী তিথিতে।

২। প্রশ্ন- করম পূজা কোন গাছকে ঘিরে করা হয় ?

উত্তর-কদম্ব গাছেকে ঘিরে।

৩। প্রশ্ন- করম পূজাতে কি কি উপকরণ ব্যবহার করা ?

উত্তর- কলাগাছ, শাপলার ফুল, ছাতা, তিল, যব, ধান, ইত্যাদি।

৪. প্রশ্ন- করম পূজার পদ্ধতি কেমন ?

উত্তর- পুরোহিত সারাদিন উপবাস করে কদম্ব ডালের গোড়ায় স্থাপন করেন নতুন গামছা এবং পাঁচ সিকি পয়সা। এই কদম্ব ডালকে ঘিরে মেয়েরা নাচতে থাকে আর ছেলের তালের সাথে সাথে মাদল বাজায়।

গ্রাম পূজার গানঃ

১. "আঁটি সাঁটি মাটি কাটি".....।

(নাম-নির্মল সরদার, স্থান-কুলতলি, তারিখ- ২২.১১.১৮, গান নং- ১৬)

গ্রাম পূজা সম্পর্কিত কথোপকথনঃ

(নাম- মঙ্গল সরদার, বয়স- ৩৫, স্থান- উত্তরমোকাম বেড়িয়া, তারিখ- ৪.২.১৯)

১. প্রশ্ন- গ্রাম পূজা কোন দেবতাকে ঘিরে করা হয়?

উত্তর- বনবিবি, শীতলা, মাসান, তুলসী পীর নামের দেবতাদের পূজা করা হয়।

২. প্রশ্ন- গ্রাম পূজা কি জন্য করা হয়?

উত্তর- গ্রামের মানুষের কল্যাণের জন্য করা হয়।

৩। প্রশ্ন- গ্রাম পূজার উপকরণ কি?

উত্তর- শূকোর, মুরগি, পাঁঠা ছাগল, সন্দেশ, বাতাসা, চাল, পান-সুপারি, মদ প্রভৃতি।

৪. প্রশ্ন- পূজো করার পদ্ধতি কেমন ?

উত্তর- যেখানে পূজো করা হয়, সেখানে বাঁশ পুঁতে তার উপর লাল ঝান্ডা লাগানো হয়। পূজার সময় পুরোহিত বাঁশের উপর ওঠে এবং কেউ কেউ গান করতে থাকে।

সহরাই গানঃ

১. "কাটরে কলার পাত, আনরে ব্যঞ্জনের ভাত".....।

(নাম-নির্মলসরদার,স্থান-কুলতলি,তারিখ- ২২.১১.১৮,

গান নং- ১৮)

সহরাই পূজা সম্পর্কিত কথোপকথনঃ

(নাম-মঙ্গল সরদার, বয়স- ৩৫, স্থান- উত্তরমোকাম বেড়িয়া, তারিখ- ৪.২.১৯)

১. প্রশ্ন- সহরাই পূজা কখন করা হয়?

উত্তর- কার্তিক মাসে অমাবস্যার তিথিতে করা হয়।

২. প্রশ্ন- এই পূজা কি ভাবে করা হয়?

উত্তর- এই পূজা করার ক্ষেত্রে একজন পুরোহিত থাকে তাকে 'পাহান' বলা হয়। গরুকে পূজা করার জন্য একটি কাঁসার উপর ধান, দূর্বা, তেল, হলুদ, সিঁদুর দেওয়া হয়। পূজার শেষে পুরোহিতকে ধূতি, গেঞ্জি, পান, হাঁড়িয়া, দেওয়া হয় সামর্থ মতো।

'এই পূজাতে রাখালগন নিমন্ত্রিত থাকে এবং সামর্থ তাদেরও কিছু পয়সা দেওয়া হয়'।(নির্মল সরদার)

৩. প্রশ্ন- এই সহরাই পূজার মন্ত্র কি ?

উত্তর- এই পূজার মন্ত্র গানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

আষাঢ়ী পূজার গানঃ

১. "খজাতে খজাতে এলি, পুছাতে পুছাতে ও".....।

(নাম-গৌর সরদার,স্থান- কুলতলি, তারিখ- ৪.২.১৯, গান নং-১৯)

আষাঢ়ী পূজা সম্পর্কে কিছু কথোপকথনঃ

(নাম-মঙ্গল সরদার, বয়স-৩৫, স্থান- উত্তরমোকাম বেড়িয়া, তারিখ- ৪.২.১৯)

১. প্রশ্ন- আষাঢ়ী পূজা কোন দেবতার উদ্দেশ্যে করা হয়?

উত্তর- পূর্বপুরুষের আত্মার স্মরনে এই পূজা করা হয়।

২. প্রশ্ন- কোন মাসে এই পূজা করা হয়?

উত্তর- এই পূজা আষাঢ় মাসে করা হয়।

৩. প্রশ্ন- এই পূজো করতে কি কি লাগে ?

উত্তর- এই পূজোতে ষাঁড়া(বাচ্ছা মোরগ), মুরগি, শূকর, ছাগল, মদ, হাঁড়িয়া লাগে।

ঝুমুর গানঃ

১. "বন জঙ্গল কাটি কুটি".....।

(নাম-তপন সরদার,স্থান- কুলতলি, তারিখ-২২.১১.১৮, গান নং- ২০)

২. "হায়রে সাধের হাঁড়িয়া".....।

(নাম-মঙ্গল সরদার, স্থান- উত্তর মোকামবেড়িয়া, তারিখ-২৬.২.১৯, গান নং-২১)

৩. "সুগারে মাই এ জ্বালা আর কত সহিব".....।

(নাম-নির্মল সরদার, স্থান- কুলতলি, তারিখ- ২২.১১.১৮, গান নং- ২২)

৪. "তাল গাছে শুঁয়ো পোকা".....।

(নাম-ভারতী সরদার, স্থান-চাতরাখালি, তারিখ-১০.২.১৯, গান নং- ২৩)

৫. "আম পাতার মাথায় রঙ".....।

(নাম-ভারতী সরদার, স্থান- চাতরাখালি, তারিখ-১০.২.১৯, গান নং- ২৪)

৬. "ও তুই ছেড়ে দে রাবণ".....।

(নাম- নির্মল সরদার , স্থান- কুলতলি, তারিখ- ২২.১১.১৮, গান নং- ২৫)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- ঘোষ, বিনয়; 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব', অরুণা প্রকাশনী, ১৩৮৬, কলকাতা।
- সাত্তার, আব্দুর; 'আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য,' বাংলা একাডেমী, ১৯৭১, ঢাকা।
- ঘোষ, বিনয়; 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি,' পুস্তক প্রকাশ, ১৯৫০, কলকাতা।
- চক্রবর্তী, রঞ্জন ও মিস্ত্রী, ইন্দ্র কুমার ; 'সুন্দরবনের অর্থনীতি, জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ', প্রকাশক-তন্দ্রিমা চন্দ্র (ভাদুড়ী), ২০০৭, কলকাতা।
- ঘোষ, প্রদ্যোত ; 'বাংলার জনজাতি', পুস্তক বিপণি, ২০০৮।
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ ;'বাংলার লোকসংস্কৃতি', জ্ঞানপ্রকাশ, ১৯৮১, কলকাতা।
- দাস, ডঃ নির্মলেন্দু ; 'সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি,' জ্ঞানপ্রকাশ, ২৩/১ কলেজ রো, ১৯৯৬, কলকাতা।
- বসু, গোপাল কৃষ্ণ ;'সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি,' আদিগঙ্গা, ২০০২।
- বাস্কে, ধীরেন্দ্র নাথ ; 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,' বাস্কে পাবলিশনস, ১৯৮৭।
- সিং, সুকুমার ; 'ভারতের আদিবাসী পরিচিতি,' ১৯৮১, কলকাতা।
- ঘোষ, সুবোধ ; 'ভারতের আদিবাসী,' ইন্ডিয়ান অ্যাসসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৩৫৫, কলকাতা।
- নস্কর, ধূর্জটি ; 'সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ,' শ্যামলী পাবলিকেশন, ১৯৯৭, কলকাতা।
- ভৌমিক, প্রবোধ কুমার; 'উপজাতির কথা,' কলকাতা।
- মজুমদার, দিব্যজ্যোতি ; 'আদিবাসী লোককথা,' ২য় খন্ড, ১৯৮৫, কলকাতা।
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ ; 'বাংলার লোকসাহিত্য,' ১৯৬৫, কলকাতা।

- মজুমদার, তুলিকা ; 'বাংলার লোকসংস্কৃতি ও গ্রামীন নারী,' লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,(পশ্চিমবঙ্গ সরকার), ২০০৬।
- মিত্র, অজিত কুমার ; 'লোকায়ত চিকিৎসা ও আদিবাসী সমাজ,' ওভারল্যান্ড, ১৯৯৩, কলকাতা।
- দাস,ডঃ অমল কুমার; 'আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতির রূপরেখা,' পশ্চিমবঙ্গের লোকসাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৯, কলকাতা।
- মুখ্যসম্পাঃ, দেবী গনেশ , সিংহ শংকর প্রসাদ , আচার্য ইন্দ্রনীল ; 'ভারতীয় ভাষা লোক সর্বেক্ষণঃ পশ্চিমবঙ্গের ভাশা,' খন্ড৩১, ভাগ৩, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১৭।
- H. H. RISLEY;"TRIBES AND CASTES OF BENGAL", VOLL-1, 1891, KOLKATA.